একা একা

হুমায়ূন আহমেদ

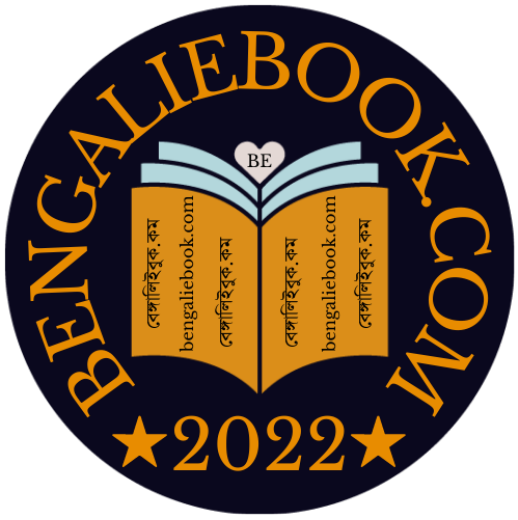

সূচিপত্র

রাত দুপুরে দুমদুম করে দরজায় কিল.....2

অল্প মাত্রায় নেশা 28

দাদাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে.....43

ছোটফুফু চলে এসেছেন.....56

দাদাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে.....69

দূর থেকে দেখলাম.....78

বাড়ির ছাদ.....86

মদ খাওয়ার ব্যাপারটা 99

কী সুন্দর লাগছে নীলুকে.....106

রাত দুপুরে দুমদুম করে দরজায় কিল

রাত দুপুরে দুমদুম করে দরজায় কিল পড়তে লাগল। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আগুনটাগুন লেগেছে কিংবা চোর এসেছে। চোর হবার সম্ভাবনাই বেশি। খুব চুরি হচ্ছে চারদিকে।

আমরা দু জনের কেউই ঘুমাই নি। ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাবুভাই তার শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। সিগারেট হাতে থাকলে সে কোনো কথাবার্তা বলে না। কাজেই আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কে?

দরজা খোল।

বড়োচাচার গলা। ধরা যেতে পারে সাংঘাতিক কিছু হয় নি। এ বাড়িতে বড়োচাচার কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজকর্ম কিছু করেন না। সে জন্যই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করে বাড়ি মাথায় তোলেন। এক বার রাত তিনটায় এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে পাহারাদার পুলিশ আমাদের গেটের কাছে বাঁশি বাজাতে লাগল। আমি এবং বাবুভাই দু জনে ছুটে গিয়ে দেখি ছোটচাচীর পোষা বেড়াল তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানার উপর বমি করেছে। বড়োচাচার সে কী চিৎকার! যেন ভয়ংকর একটা কিছু হয়েছে।

আজ রাতেও নিশ্চয়ই সে রকম কিছু হবে। হয়তো চাচীর বেড়াল তাঁর ঘরে গিয়ে কুকীর্তি করে এসেছে। আর এই নিয়ে ঘুমুবার সময়টায় তিনি লাফঝাঁপ শুরু করেছেন।

দরজা খুলতে বললাম, কানো যায় না?

ব্যাপারটা কী?

চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব। লাটসাহেব কোথাকার। দরজা খোল।

বাবুভাই সিগারেট ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, রাত দুপুরে কী শুরু করেছেন?

কি শুরু করেছি মানে? একটা মানুষ মারা যাচ্ছে!

কে মারা যাচ্ছে?

বড়োচাচা তার উত্তর না দিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি কষলেন। দরজায়।

বাবুভাই উঠে দরজা খুলল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, কে মারা যাচ্ছে?

বড়োচাচা হুঁঙ্কার দিয়ে বললেন, সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না, নিচে যা।

হয়েছেটা কি বলবেন তো?

বাবার অবস্থা বেশি ভালো না।

স্ট্রোক হয়েছে নাকি?

হতে পারে। অবস্থা খুব সিরিয়াস। খুবই সিরিয়াস।

বড়োচাচাকে দেখে মনে হল না। তিনি খুব বিচলিত। বরঞ্চ এই উপলক্ষে হৈচৈ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁকে বেশ খুশিখুশিই মনে হল। অনেক দিন পর একটা দায়িত্ব পেয়েছেন।

সবাইকে খবর দেওয়া দরকার। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই এখন। উফ, কী ঝামেলা!

তিনি ঝড়ের মতো নিচে নেমে গেলেন। তাঁর গলা অবশ্যি শোনা যেতে লাগল, ড্রাইভার কোথায়? ড্রাইভার? কাজের সময় সব কোথায় যায়? পেয়েছে কী?

বারান্দার লাইট জ্বলিল। চটি ফট্‌ফটু করে কে যেন নামল। ছোটচাচা? এ বাড়িতে ছোটচাচাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চটি পরেন এবং শব্দ করে হাঁটেন। নিশ্চয়ই তিনি।

বাবুভাই আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। চিন্তিত স্বরে বলল, তুই চট করে দেখে আয় সত্যি সত্যি অবস্থা খারাপ কি না। আমার মনে হয় বাবা ২৮২ 6bb◌Ig5ছ!

নিচে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি খারাপ। দাদার ঘরে অনেক লোকজন। ছোটচাচা, বড়োচাচা, শাহানা, আমাদের ভাড়াটে রমিজ সাহেব। কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। তাঁর খাটটি সরিয়ে সিলিং ফ্যানের ঠিক নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। রাখা হয়েছে আধশোওয়া করে। তিনি হাত দুটি ছাড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করছেন। পৃথিবীতে এত অক্সিজেন, কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ ফুসফুসটাকে তিনি আর ভরাতে পারছেন না। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শাহানা একটি হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু সে ক্রমাগত পাখা নেড়ে যাচ্ছে। তার মুখ হয়েছে পাংশুবর্ণ। লম্বাটে মুখ আরো লম্বা দেখাচ্ছে।

দাদা কি একটা বলতে চেষ্টা করলেন। শ্লেষ্মা-জড়িত স্বর, কিছুই বোঝা গেল না। বড়োচাচী চেয়ারে বসে ছিলেন। তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, কী বলছেন রে?

কি জানি কী?

শাহানা, তুই কিছু বুঝতে পারলি?

জ্বি-না মামী।

দাদা এবার স্পষ্ট বলে উঠলেন, মিনু, ও মিনু।

মিনু আমাদের সবচেয়ে বড়ো ফুফু। ন বছর বয়সে গলায় কি একটা ঘা (খুব সম্ভব ক্যানসোর) হয়ে মারা গিয়েছিল। অল্পবয়সে মৃত্যু হবে বলেই হয়তো রাজকন্যার মতো রূপ নিয়ে এসেছিল। আমাদের বসার ঘরে এই ফুফুর একটি বাঁধান ছবি আছে।

দাদা আবার বিড়বিড় করে কী বললেন। তাঁর বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগল। শাহানা আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, বড়ো ভয় লাগছে।

ভয়ের কী আছে?

একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, এটা ভয়ের না, কী বলছিস তুই?

দাদা ছটফট করতে লাগলেন। এক জন মানুষ শ্বাস নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর আমরা এত সহজে নিঃশাস নিচ্ছি। আমার দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জাই লাগল।

দাদা তাহলে সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছেন। ইদানীং তাঁর সাথে আমার খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হত না। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকতেন, কে যায়, বাবু? বাবু না? তাহলে কে, টগর? এ্যাই টগর এ্যাই। আমি না শোনার ভান করে দ্রুত বেরিয়ে যেতাম। কী কথা বলব তাঁর সাথে? দাদার নিজের কোনো কথা নেই বলার। আমারও নেই। এক জন বুড়ো মানুষ, যার স্মৃতিশক্তি নেই, গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁর কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকা যায় না।

কিন্তু মানুষ শুধু কথা বলতে চায়। সর্বক্ষণ চায় কেউ না কেউ থাকুক তার পাশে। কে থাকবে এত সময় তাঁর কাছে? দাদা তা বোঝেন না। তাঁর ধারণা পৃথিবীর সবারই তাঁর মতো অখণ্ড অবসর। কাজেই তিনি কান খাড়া করে দরজার পাশে সারা দিন এবং প্রায় সারা রাত বসে থাকেন। কারো পায়ের শব্দ পাওয়া গেলেই ডাকেন, কে যায়? কে এটা, কথা বলে না যে, কে?

বাধ্য হয়ে কোনো কোনো দিন যেতে হয় তাঁর ঘরে। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, কে তুই, বাবু?

জ্বি-না, আমি টগর।

তোর পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

কখন পরীক্ষা, কী পরীক্ষা, কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা তাঁর পরীক্ষা দিয়েই শুরু হয়। আমি ঝামেলা কমাবার জন্যে বলি, ভালোই।

ডিভিসন থাকবে।

জ্বি থাকবে? অঙ্ক ভালো হয়েছে? অঙ্কটাই আসল ডিভিসন হয় অঙ্ক আর ইংরেজিতে। ইংরেজি কেমন হয়েছে?

ভালোই হয়েছে।

আমি আসিতে আসিতে টেন ছাড়িয়া দিল,–এর ইংরেজি বল দেখি? দাদার সঙ্গে কথা বলার এই যন্ত্রণা। আমি এম-এস সি করছি বোটানিতে, কিন্তু তাঁর কাছে বসলেই একটা ইংরেজি ট্রানস্লেশান করতে হবে। মাসখানেক আগে এক বার বাবুভাইকে ডেকে এনে পাটিগণিতের অঙ্ক কষতে দিলেন। সে অঙ্ক আবার পদ্যে লেখা–অর্ধেক পঙ্কে তার, তোহাই সলিলে। নবম ভাগের ভাগ শৈবালের জলে–ইত্যাদি। বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, দাদা, আমি পাশটাশ করে ইণ্ডেন্টিংয়ের অফিস খুলেছি, এখন বসে বসে পাটিগণিত করব নাকি?

তুই আবার পাশ করলি কবে?

এম. এ. পাশ করলাম দুই বছর আগে।

বলিস কি! কোন ক্লাস পেয়েছিস?

আপনাকে নিয়ে তো মহা মুসিবত দেখি।

দাদাকে নিয়ে মুসিবত শুরু হয়েছে বেশ অনেক দিন থেকেই। বছর তিন ধরে হঠাৎ করে তার মাথায় গণ্ডগোল হতে শুরু করে। ব্যাপারটা সাময়িক। দিন দশেক থাকে। আবার সেরে যায়, আবার হয়! মস্তিষ্কবিকৃতির সময়টা বাড়িসুদ্ধ লোককে তিনি অস্থির করে রাখেন। এই সময় তিনি কিছুই খান না। ভাত মাখাবার সময় তিনি নাকি দেখতে পান একটা কালো রঙের বেড়াল থাবা দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাত মাখছে। কাজেই তিনি ভাত খেতে পারেন না। এক জনকে তখন প্লেট উঁচু করে রাখতে হয় (যাতে বেড়ালে ভাত ছুতে না পারে}। অন্য এক জনকে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দিতে হয়। তুলে দেওয়া ভাত ও বেশিক্ষণ খেতে পারেন না। দু-এক দল মুখে ভুলেই চেঁচাতে থাকেন, বেড়াল গা বেয়ে উঠছে। গা বেয়ে উঠছে। চেঁচাতে চেঁচাতে এক সময় বমি করে ফেলেন। কী কষ্ট, কী কষ্ট!

অসুখের আগেও যে তাঁর সময় খব ভালো যাচ্ছিল তা নয়। দিনের বেশির ভাগ সময় বসে থাকতেন বারান্দায়। ইজিচেয়ারে আধশোওয়া হয়ে সমস্ত দিন একা একা পড়ে থাকা নিশ্চয়ই কষ্টকর ব্যাপার। ঠিক এই বয়সে, এই অবস্থায় এক জন মানুষ কী ভাবে।–কে জানে? বসার ভঙ্গিটা অবশ্য অপেক্ষা করার ভঙ্গি। যেন কোনোএকটি বড়ো কিছুর জন্যে অপেক্ষা। সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যু। বারান্দার অন্ধকার কোণায় এক কালের এক জন প্রবল প্রতাপের মানুষ আধোজ্যগ্রত অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। চিত্রটি অস্বস্তিকর।

এখন রাত এগারটা পঁচিশ। দাদার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ জগতের জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হতে বেশি দেরি নেই। তাঁর বা চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। জীবনের সর্বশেষ যাত্রাটি সুসহ করা হল না কেন কে জানে?

আকবরের মা প্রকাণ্ড একটা গামলাভর্তি ফুটন্ত পানি এনে হাজির করল। বড়োচাচী অবাক হয়ে বললেন, গরম পানি কি জন্যে?

আমি কি জানি? আমারে আনতে কইছে আনছি।

শাহানা, গরম পানির কথা কে বলেছে?

আমি জানি না, মামী।

কি যে এদের কাণ্ড! এই আকবরের মা, পানি নিয়ে যাও তো। কে বলেছে। তোমাকে পানির কথা?

বড়ো মিয়া কইছেন।

যাও, নিয়ে যাও।

আকবরের মা পানি নিয়ে যেতে গিয়ে ইচ্ছে করেই অর্ধেক পানি ফেলে ঘর ভাসিয়ে দিল। আমি দাদার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বারান্দার এক প্রান্তে উগ্র মূর্তিতে বড়োচাচাকে দেখা গেল। তাঁর সামনে কালাম। কালামের মুখ পাংশুবর্ণ।

আজকে তোর চামড়া খুলে ফেলব। মানুষ মারা যাচ্ছে বাড়িতে, আর তোর আজকে না ঘুমালে শরীর খারাপ করবে? লাটসাহেব আর কি।

আমাকে দেখে বড়োচাচার কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। কালামের গালে প্রকান্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মেঘস্বরে বললেন, তোকে যে বললাম সবাইকে খবর দিতে, দিয়েছিস?

জ্বি-না, দিই নি। দেব।

একটা কথা কত বার বলা লাগে?

যাচ্ছি।

যাচ্ছিটা কখন? নিজের চোখে অবস্থাটা দেখছিস না?

চাচা, ডাক্তার আনতে কেউ গিয়েছে?

রমিজ সাহেব গিয়েছেন। রমিজ এলে তুই গাড়ি নিয়ে যাবি। বাবুকে সঙ্গে নিস। সেই মাতবরটা কোথায়?

উপরে আছে।

যা, ডেকে নিয়ে আয়। অন্য বাড়ির লোকজন ছোটাছুটি করছে, আর নিজেদের কারোর খোঁজ নেই। আফসোস।

অন্য বাড়ির লোক–অর্থাৎ রমিজ সাহেব। লম্বা কালো মোটাসোটা একটা মানুষ, যাদের দেখলেই মনে হয় এদের জন্ম হয়েছে অভাব অনটনে থাকবার জন্যে। তিনি আমাদের

ভাড়াটে। একতলার চারটা কামরা নিয়ে আজ সাত বছর ধরে আছেন। এই সাত বছর কোনো ভাড়া বাড়ান হয় নি। কিন্তু তবু রমিজ সাহেব তাঁর নামমাত্র ভাড়াও নিয়মিত দিতে পারেন না। হাত কচলে চোখেমুখে দীন একটা ভাব ফুটিয়ে আমার বাবাকে গিয়ে বলেন, রহমান সাহেব, একটা বড়ো বিপদে পড়েছি।–আমার ছোট শালীর এক ছেলে–

রামিজ সাহেবের বাড়িভাড়া না-দেওয়ার কারণগুলি সাধারণত বিচিত্র হয়ে থাকে, এবং তা শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য কারো থাকে না; বাবাকে এক সময় বিরক্ত হয়ে বলতে হয়, থাক, থাকা; একটু রেগুলার হবার চেষ্টা করবেন, বুঝলেন?

জ্বি স্যার। আর দেরি হবে না।

রেগুলার হবার কোনো রকম চেষ্টা অবশ্যি দেখা যায় না। তিনি নিজের অংশের একটা ঘর সাবলেট দিয়ে ফেলেন গোঁফ ওয়ালা বেটে একটা ভদ্রলোককে। আমাদের অবশ্য বলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বিপদে পড়েছে, তাই দিন দশেক থাকবে। সেই লোক মাস দুয়েক থাকার পর আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বড়োচাচা খুব রাগলেন। গলার রগ ফুলিয়ে বললেন, সব কটাকে ঘাতু ধরে বের করে দাও। ফাজলামি পেয়েছে? বেঁটে লোকটা খুব হরি-তথি শুরু করল, বললেই হয়, দেশে আইন-আদালত নাই? এভিকশন কি মুখের কথা? এতে বড়োচাচা আরো বেশি রেগে গেলেন এবং হুকুম দিলেন বাড়ির সব জিনিসপত্র বাইরে বের করে দিতে। আমাদের বাড়ির চাকর-ব্যাকররা অনেক দিন পর একটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটবার উপক্রম দেখে উৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে আলনা, ট্রাঙ্ক, চেয়ার, টেবিল বাইরে এনে ফেলতে লাগল। আমি হৈ-চৈ শুনে বারান্দায় এসে দেখি রামিজ সাহেবের স্ত্রী রক্তশূন্য

মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। এই সময় বাবুভাই এল কোথেকে এবং সে খুব স্বাক হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, এইসব কি?

আকবরের মা একগাল হেসে বলল, বড়ো ভাই, এরারে বাড়ি থাইক্যা বাইর কইরা দিতেছি।

রমিজ সাহেবের বড়ো মেয়েটা শব্দ করে ফুঁফিয়ে উঠল। বাবুভাই গম্ভীর মুখে বললেন, জিনিসপত্র সব ঘরে নিয়ে ঢোকাও, এইসব কি?

বড়োচাচা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বাবুভাই তার আগেই এগিয়ে এসে কালামের গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। কালাম হৃষ্টচিত্তে একটা মিটসেফ ঠেলা ঠেলি করে আনছিল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বাবুভাই যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে নিজের ঘরে চলে এলেন।

সে-দিন আমি বেশ কিছু জিনিস প্রথম বারের মতন লক্ষ করলাম। যেমন–রামিজ সাহেবের চার মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। রামিজ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর চেহারা মোটামুটি ধরনের, কিন্তু তাদের চারটি মেয়েই দেখতে চমৎকার। সবচেয়ে বড়োটির (যার নাম নীলু) এমন মায়াকাড়া চেহারা। সব কটি বোনের মধ্যে একটা অন্য রকম স্নিগ্ধ ভাবে আছে। তা ছাড়া বাচ্চাগুলি এম্নিতেও শান্ত। চিৎকার চেঁচামেচি কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ল না।

এর কিছু দিন পরই রমিজ সাহেব হাসিমুখে এক প্যাকেট লাডছু হাতে দোতলায় এলেন। বড়ো মেয়েটি তাঁর পেছনে। ব্যাপার কী? বড়ো মেয়ে, যার নাম নীলু, সে ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছে। রমিজ সাহেব সব কটি দাঁত বের করে হাসতে— হাসতে বললেন, ঘরের কাজকর্ম করে সময়ই পায় না। সময় পেলে স্যার আরো ভালো হত।

বাবা অবাক হয়েই বললেন, কত টাকার বৃত্তি?

মাসে চল্লিশ টাকা স্যার। আর বই কেনা বাবদ্র বৎসরে দুই শ টাকা।

বাহ, বেশ তো!

মেয়েটার জন্য দেয়া করবেন স্যার।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

দোতলা থেকে তারা রওনা হল তিন তলায়। এই সময় দেখা হল আমার সঙ্গে।

এই যে ভাই সাহেব, আমার এই মেয়েটা...

শুনেছি, বাবাকে বলছিলেন। আমি বারান্দায় ছিলাম। খুব ভালো খবর!

নীলু, কদমবুসি কর, টগর সাহেবকে।

আমি আঁৎকে উঠলাম, আরে না-না।

না-না কি? মুরুব্বির দোয়া ছাড়া কিছু হয় নাকি? এ্যাঁ?

রামিজ সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। আজ আর তিনি দীন ভাড়াটে নন। আজ এক জন অহংকারী বাবা।

আমি বললাম, তোমার নাম কী?

নীলু।

রামিজ সাহেব গর্জে উঠলেন, ভালো নাম বল।

নীলাঞ্জনা।

রামিজ সাহেব হৃষ্টচিত্তে বললেন, ওর মা-র রাখা নাম। আমি নাম দিয়েছিলাম জোবেদা খানম। সেটা তার মায়ের পছন্দ হল না। নামটা নাকি পুরানা। আরে ভাই আমি নিজেও তো পুরানা। হা-হা-হা।

বাবা মেয়েটির জন্য একটা পার্কার কলম কিনে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কলমের প্রসঙ্গ রামিজ সাহেব সময়ে-অসময়ে কত বার যে তোলেন তার ঠিক নেই। যেমন দিন সাতেক পর রিমিজি সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে দেখা হল। তিনি এক%াল হেসে বললেন, কাণ্ড শুনেছেন নাকি ভাই?

কী কাণ্ড?

পার্কার কলমটা যে দিয়েছেন আপনারা-নিলু স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। ক্লাস ছুটি হওয়ার পর আর পায় না। মেয়ে তো কাঁদতে কাঁদতে বাসায় আসছে। আমি দিলাম এক চড়। মেজাজ কি ঠিক থাকে, বলেন আপনি? শেষে তার ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল। দেখেন অবস্থা। হা-হা-হা।

নীলুর সঙ্গে আমার খানিকটা খাতিরও হল অন্য একটি কারণে। এক দিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এক নয়, সঙ্গে আরো কয়েকটি মেয়ে। স্কুল-ড্রেস পরা থাকলে যা হয়–সব কটাকে অবিকল এক রকম লাগে। তবুও এর মধ্যে নীলুকে চিনতে পারলাম, এ্যাই নীলু।

নীলু হকচকিয়ে এগিয়ে এল।

যাচ্ছ কোথায়? এ লাইনে তো মিরপুরের বাস যায়।

কল্যাণপুর যাচ্ছি। আমাদের এক বন্ধুর আজ গায়ে হলুদ, আমাদের যেতে বলেছে।

ঐ ওরাও যাচ্ছে তোমার সাথে?

জ্বি।

উঠে পড় গাড়িতে। পৌঁছে দিই। যে ভিড়, এখন আর বাসে উঠতে পারবে না।

নীলু ইতস্তত করতে লাগল। যেন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় মস্ত অপরাধ হয়েছে। অন্য মেয়েগুলি অবশ্যি খুব হৈ-চৈ করে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারা খুব খুশি।

সারা দিন থাকবে তোমরা?

নীলু জবাব দিল না। কালোমতো একটি মেয়ে হাসিমুখে বলল, আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সবাই বাসায় বলে এসেছি। শুধু নীলু বলে আসে নি।

কেন, নীলু বলে আস নি কেন?

নীলু তারও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। কালো মেয়েটা বললো, নীলু। তার মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। দু দিন ধরে ওদের মধ্যে কথা বন্ধ।

তাই বুঝি?

জ্বি, ও যখন আজ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরবে, তখন মজাটা টের পাবে।

সব কটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। ব্যাক ভিউ মিররে দেখলাম নীলুর চোখে জল এসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর নীলুদের বাসায় সত্যি সত্যি দারুণ অবস্থা। রমিজ সাহেব কাঁদো। কাঁদো হয়ে বাবুভাইকে গিয়ে বললেন, ভাইসোব শুনেছেন, আমার মেয়েটা কিডন্যাপ হয়েছে।

কী বলছেন এইসব?

জ্বি ভাইসব, সত্যি কথাই বলছি। রমিজ সাহেব ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, এসে পড়বে, হয়তো বন্ধুর বাড়িটাড়ি গিয়েছে।

আমার মেয়ে না বলে কোথাও যাবে না। টগর সাহেব।

নীলু সে রাতে বাড়ি এসে পৌঁছে রাত পৌণে আটটায়। ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে মুরুরি কিসিমের এক ভদ্রলোক এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের নিচতলায় প্রলয়ের মতো হয়ে গেল। রামিজ সাহেব কেঁদে গিয়ে পড়লেন। আমার বড়োচাচার কাছে। বড়োচাচা একটা কাজ পেয়ে লাফ-ঝাঁপ দিতে শুরু করলেন–এই থানায় টেলিফোন করছেন, ঐ করছেন হাসপাতালে, এক বার শুনলাম অত্যন্ত গভীর ভঙ্গিতে কাকে যেন বলছেন, আরে ভাই, বলতে গেলে বাসার সামনে থেকে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। এই দেশে বাস করা অসম্ভব।

আমি সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলাম গাড়ি এসে ঢুকেছে। ডাক্তার চলে এসেছে। কোন জন এসেছে কে জানে? বড়ো রাস্তার মোড়ে এক জন ডাক্তার থাকেন, যাকে দেখেই যক্ষ্মারোগী বলে ভ্রম হয়। দাদার জন্যে তিনি হচ্ছেন ফুলটাইম ডাক্তার। তাঁর নাম প্রদ্যোত বাবু বা এই ধরনের কিছু। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি এ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি টোটকা অষুধ দেন। বাবুভাইয়ের এক বার টনসিল ফুলে বিশ্রী অবস্থা হল। কিছুই গিলতে পারেন না। এক শ দুই জ্বর গায়ে। প্রদ্যোত বাবু এসেই গম্ভীর মুখে বললেন বানরলাঠি গাছের ফল পিষে গলায় প্রলেপ দিতে। এটাই নাকি মহৌষধ।

বাবুভাই দারুণ রেগে গেল। চিঁ চিঁ করে বলল, শালা মালাউন কবিরাজী শুরু করেছে।

প্রদ্যোত বাবু (কিংবা পীযূষ বাবু), কিন্তু সত্যি সত্যি বানরলাঠি গাছের ফল যোগাড় করে পুলটিশ লাগিয়ে ছাড়লেন। অসুখ আরাম হল। যদিও বাবুভাইয়ের ধারণা, এম্নিতেই সারিত। শরীরের নিজস্ব রোগপ্রতিরোধের মেকানিজমেই সেরেছে।

যাই হোক, প্রদ্যোত বাবুর আমাদের বাড়িতে মোটামুটি একটা সম্মানের আসন আছে। তিনি বাড়ি এলেই তাঁর জন্য দুধ-ছাড়া চা হয়, সন্দেশ আনান হয় এবং বাবা নিজে নেমে এসে কথাবার্তা। বলেন।

এই যে ডাক্তার, যাওয়ার আগে আমার প্রেশারটা দেখে যাবে।

বিনা কী-তে প্রেশার দেখা ছেড়ে দিয়েছি রহমান সাহেব। মেডিকেল এথিক্সের ব্যাপার আছে–হা-হা-হা।

আজ দেখলাম আমাদের প্রদ্যোত বাবু ছাড়াও অন্য এক জন ডাক্তার নামলেন। সেই ভদ্রলোকের চোখেমুখে সীমাহীন বিরক্তি, যার মানে তিনি এক জন বড়ো ডাক্তার। পিজির কিংবা মেডিক্যালের প্রফেসর বা এসোসিয়েট প্রফেসর। ভদ্রলোকের বিরক্তি দেখি ক্রমেই বাড়ছে। গাড়ি থেকে নেমেই হাতঘড়ি দেখলেন। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেখি ভদ্রলোক যে কতক্ষণ থাকেন তার মাঝে মোট কবার হাতঘড়ি দেখেন। কিন্তু এখন এসব এক্সপেরিমেন্টের ভালো সময় নয়। গাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে যেতে হবে। যে দুই ফুফু ঢাকায় আছেন তাঁদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র নীলু, ডাকল, টগর ভাই। এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। আচমকা কথা বলে চমকে দেয়।

দাদার অবস্থা কি বেশি খারাপ?

মনে হয়। রাতের মধ্যেই কাম সাফ হবার সম্ভাবনা।

টগর ভাই, আপনি সব সময় এইভাবে কথা বলেন কেন?

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। মেয়েটা চোখের সামনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। বড়ো হচ্ছে এবং সুন্দর হচ্ছে; মেয়েরা লতান লাউগাছের চারার মতো। এই দেখা যাচ্ছে ছোট্ট এক রাত্তি একটা চারা, কয়েকটা দিন অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ চোখে পড়লেই দেখা যাবে নিজেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সতেজ বলবান একটি জীবন।

আচ্ছা, তুই এখন কি পড়িস যেন? (নীলুকে আমি তুই বলি। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হয়। আমার সঙ্গে কথা বলার একটা গোপন অনুগ্রহ ওর আছে।)

সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। বখশিবাজার কলেজে।

সেকেণ্ড ইয়ারে আবার কবে উঠলি?

নীলু, সে-কথার জবাব না দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, আমাকে তুই-তুই করে বলেন কেন?

সেদিনকার পুঁচকে মেয়ে, তোকে আবার আপনি-আপনি বলতে হবে নাকি?

আমি দোতলায় চলে গেলাম। বাবুভাইয়ের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বারান্দায় আলো নেই। তার ঘরও অন্ধ-গর। আমি ঘরে ঢুকে সুইচ টিপলাম, আলো জ্বলল না। বাবুভাইয়ের গলা শোনা গেল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়, টগর।

কী ব্যাপার? লাইট ফিউজ নাকি?

উঁহু, বান্ধ খুলে ফেলেছি। ঘর অন্ধকার দেখলে কেউ আর খোঁজ করবে না। মনে করবের কাজেকর্মেই আছি।

বারান্দাটারও খুলে ফেলেছি নাকি?

হুঁ। কামেলা ভালো লাগে না। রাতদুপুরে এর বাড়ি যাও, ওর বাড়ি যাও।–বাল্ব খুলে জমাট অন্ধকার করে দিলাম।

বাবুভাই সিগারেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, মরবার সময় হয়েছে মরবে, এত হৈ-চৈ কী জন্যে?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবুভাই বলল, শুয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম।

কী-সব কথা?

যেমন ধর মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যে জানে এক দিন তাকে মরতে হবে। অন্য কোনো প্রাণী তা জানে না।

বুঝলে কী করে, অন্য প্রাণীরা জানে না? কথা বলেছ তাদের সাথে?

কথা না বলেও বোঝা যায়। অন্য কোনো প্রাণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয় না। মানুষ নেয়।

আমিও সিগারেট ধরলাম। বাবুভাই বলল, বুড়োর অবস্থা কী?

ভালো না।

মৃত্যু ব্যাপারটা কুৎসিত। একসেপ্ট করা যায় না।

যাবে না কী জন্যে? কুৎসিত জিনিস কি আমরা একসেপ্ট করি না? সব সময় করি।

মৃত্যু স্বীকার করে নিই, কিন্তু একসেপ্ট করি না।

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল বাবুভাই এক ফাঁকে তার টাঙ্ক খুলে ঐটি বের করে দু-এক ঢোক খেয়েছে। বাবুভাইয়ের এই অভ্যেসটি নতুন। যে ভাবে তা প্রথম শুরু হয়েছিল, তাতে আমার ধারণা হয়েছিল অভ্যেসটি স্থায়ী হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে স্থায়ী হয়েছে। আমি মৃদু স্বরে বললাম, তুমি কিছু খেয়েছ নাকি?

হুঁ। বেশি না। আধা গ্লাসও হবে না। মৃত্যুর মতো একটি কুৎসিত ব্যাপার একসেপ্ট করতে হলে নার্ভগুলিকে আংশিক অকেজো করে দিতে হয়। তুই এক ঢোক খাবি নাকি? ভালো জিনিস। ব্ল্যাক টাওয়ার। খাস জার্মান জিনিস। চমৎকার!

এখন না।

বাবুভাই বিছানা থেকে নেমে টাঙ্ক খুলল। আমি বললাম, আরো খাচ্ছ নাকি?

জাস্ট এ লিটল।

একটা কেলেঙ্কারি করবে শেষে।

তুই পাগল হয়েছিস? কেউ টের পাবে না।

বড়োচাচার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। এ বাড়ির কারো পায়ের শব্দ আমি চিনি না, কিন্তু বড়োচাচার প্যায়ের শব্দ চিনি। তিনি কেমন যেন লাফিয়ে—লাফিয়ে চলেন বলে মনে হয়। থপথপ করে বানর হাঁটার মতো শব্দ হয়।

বড়োচাচা বারান্দার মাঝামাঝি গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, লাইট কোথায় গেল? আর বাম্বটা ফিউজ হল কখন? এই এই! টগর টগর।

বড়োচাচা আমাদের ঘরেও এক বার উঁকি দিলেন। তারপর আবার বানরের মতো থপথপ শব্দ করে তেতলায় উঠে গেলেন। নেমে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বান্ধ নিয়ে এসেছেন বোধ হয়। কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় এক শ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল। বড়োচাচা আবার থপথপ শব্দ করে নিচে নেমে যেতেই বাবু ভাই বান্ধটা খুলে নিয়ে এল। ব্ল্যাক টাওয়ার আমিও খানিকটা চেখে দেখলাম। জিনিসটা মন্দ নয়। কেমন যেন পচা নারকেলের পানির মতো। রাত বাজে দুটা দশ। বাবুভাই মৃদু স্বরে বলল, বুড়ে তাহলে মরেই যাচ্ছে?

তা বোধহয় যাচ্ছে।

দুঃখের ব্যাপার। বুড়োর সাথে আমার খাতির ছিল।

তোমার একার না, সবারই খাতির ছিল।

হুঁ। খুব মাই-ডিয়ার টাইপ ছিলেন।

কথাটা ঠিক নয়। দাদা মাই—ডিয়ার টাইপ নন। তিনি এক জন কঠিন প্রকৃতির মানুষ। তবে বাবুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল। সুস্থ থাকাকালীন রোজ এক বার করে খোঁজ করতেন–বাবু আছে? বাবুভাই বিরক্ত হয়ে বলতেন, বুড়োর যন্ত্রণায় শান্তিতে থাকা মুশকিল। তা সম্রাট শাহজাহান আমার কাছে চায় কী?

দাদাকে আড়ালে আমরা সম্রাট শাহজাহন এবং শাহানাকে জাহানারা ডাকি। দাদাও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির ভগ্ন ছবি হয়ে সারা দুপুর জাহানারার সঙ্গে গুজগুজ করেন। অনেক বয়স পর্যন্ত বেচে থাকাটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।

বাবুভাই বোতলের আরো খানিকটা গলায় ঢালিল। আমি মৃদু স্বরে ডাকলাম, বাবুভাই!

হুঁ।

তোমার কি মনে হয়, মৃত্যুর পর কিছু আছে?

খুব সম্ভব আছে। থাকারই কথা।

বাবুভাই ঢকচক করে গ্লাসে আরো খানিকটা ঢালল।

বাবু ভাই, আর খেয়ে না। তুমি বেশি খাচ্ছি।

বেশি কোথায় দেখলি?

শেষে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

কিছুই করব না।

বড়োচাচার গলার শব্দ শোনা গেল, আরে, এই বান্ধটা কোথায় গেল? ব্যাপার কি? বাবুভাই খিকখিক করে হাসতে লাগল।

কে হাসে, এই কে হাসে? বাবু, বাবু। এই টগর।

আমার মনে হল, বড়োচাচা খানিকটা ভয় পেয়েছেন। গলার স্বর কেমন কাঁপা কাঁপা।

কে হাসছিল? এই এই। কালাম! এই কালাম!

বড়োচাচা দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। তিনি সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছেন।

মগবাজারের ফুফু এলেন সবার আগে। নিজের গাড়ি আনলেন না। তাঁকে গিয়ে নিয়ে আসতে হল। তাঁর গাড়ির কাবুরেটরে নাকি কি একটা প্রবলেম হয়েছে। আমাদের বাড়িতে

আসতে হলেই তাঁর গাড়ির কাবুরেটরে প্রবলেম হয় কিংবা ব্রেক শু লুজ থাকে। বাবুতাইয়ের ধারণা, সমস্ত ঢাকা শহরে মগবাজারের ফুফুর চেয়ে কৃপণ এবং ধূর্ত মহিলা এখনো জন্মায় নি এবং ভবিষ্যতেও জন্মানির সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গেলে তিনি চমৎকার জাপানী কফি-কাপে চা দেন। উদ্দেশ্য একটিই–কাপগুলি ছোট। চায়ের সঙ্গে কখনো কিছু থাকে না। আমরা কেউ দুপুরের দিকে তাঁর বাসায় গেলে তিনি বিরক্ত স্বরে বলেন, খবর দিয়ে আসতে পারিস না? ভাত চড়িয়ে ফেলেছে।

ভাত খাব না।

দুপুরে আবার ভাত খাবি না কি? বাস খানিকক্ষণ, আবার ভাত চড়াবে। কতক্ষণ আর লাগবে। রাইস কুকার আছে।

না ফুফু, বসতে পারব না।

শুধুমুখে যাবি? সময় হাতে নিয়ে আসতে পারিস না? সব সময় তাড়া, সব সময় তাড়া! কী এমন রাজকার্য তোদের?

মগবাজারের ফুফুকে আমরা কেউ সহ্য করতে পারি না। বাবুভাই প্রায় খোলাখুলি এমন সব অপমানজনক কথাবার্তা বলে যে অন্য কেউ হলে বড়ো রকমের ঝামেলা বেধে যেত। মগবাজারের ফুফু, অসম্ভব ধূর্ত বলেই কোনো কথা গায়ে মাখেন না এবং এমন ভাব করেন যে কিছু বুঝতে পারেন নি।

গত বছর শীতের সময় তিনি হঠাৎ এসে বললেন, ফরিদের (তাঁর ছেলে) গ্রাজুয়েশন হবে সামারে, তাঁকে গ্রাজুয়েশন সেরিমনি এ্যাটেণ্ড করতে যেতে হবে। বাবুভাই গম্ভীর হয়ে বলল, বলেন কি ফুফু, ফরিদ ভাই তো দেশে তিন ধাক্কায়ও আই এ পাস করতে পারল না। ঐখানে গিয়ে একেবারে এম এ পাস করে ফেলল!

দেশে কি পড়াশোনা হয়? বিদেশে পড়াশোনার একটা এ্যাটমোসফিয়ার আছে। টিচাররা যত্ন নেয়।

এখানের ছেলেমেয়ে যেগুলি পাস করে, সেগুলি কীভাবে করে?

কি জানি কীভাবে করে? নকল ছাড়া তো আমি কিছু জানি না।

ফুফু, হাই তোলেন। কথা বন্ধ করতে চান। বাবুভাই ছোড়বার পাত্র না। সে প্যাঁচাবেই।

ফরিদ ভাই তো মন্দ দেখায় নি। এইখানে ছিল আই এ ফেল, বিলেতে গিয়ে দুই বছরে একেবারে এম এ 1

ফুফু, গম্ভীর হয়ে বললেন, ও দেশে তো আর আমাদের মতো নিয়ম না।–যে দুই বছর পড়তে হবে আই এ, দুই বছর পড়তে হবে বি এ, ওদের দেশে অন্য ব্যবস্থা।

ফরিদ ভাই দেশে আসবে?

আসবে। একটা মেয়েটেয়ে দেখ দেখি। ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে নাকি সুন্দর-সুন্দর মেয়ে আছে?

মগবাজারের ফুফুর সঙ্গে কথা শুরু হলে তা এক সময় না এক সময় সুন্দরসুন্দর মেয়েতে এসে থেমে যাবে। গত চার বছর ধরে তিনি সুন্দর মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোনোটাই তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। হয় নাকটা প্রয়োজনের তুলনায় ছোট, কিংবা ঠোঁট একটু মোটা। সব কিছুই যখন ঠিক থাকে, তখন দেখা যায় মেয়েটা বেটে। বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়ে প্রসঙ্গে ফুফুর সার্ভে হচ্ছে–এদেশে সুন্দরী মেয়ে নেই। যে কটি আছে তারা হয় বেটে, নয় শ্বেতী রোগগ্রস্তা।

অল্প মাত্রায় নেশা

আমার মনে হচ্ছে বাবুভাইয়ের অল্প মাত্রায় নেশা হয়েছে। সে গুনগুন করে গাইছে–

Pretty girls are everywhere
and if you call me I will be there

কিংস্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান। যে—বাড়িতে এক জন বৃদ্ধ মানুষ মারা যাচ্ছে সে-বাড়ির ছেলে ঘর অন্ধকার করে চুকচুক করে ব্লাক টাওয়ার খাচ্ছে এবং কিংদেষ্টান ট্রায়ের প্রেমের গান গাইছে–ব্যাপারটা দারুণ রিপালসিভ। তার চেয়ে বড়ো কথা, বড়ো ফুফু, এসে পৌঁছেছেন। তিনি ব্যাপারটা ধরতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে। মানুষকে অপদস্থ করার মধ্যে তিনি এক ধরনের আনন্দ পান।

ক্লাস সেভেনে আমি যখন ফেল করলাম, তখনকার কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার আশপাশে যখনই অপরিচিত কেউ থাকত, বড়ো ফুফু। কথাবার্তা পড়াশোনার দিকে টেনে এনে এক সময় বলতেন, এই দেখেন না।–টগরটা ক্লাশ সেভেন পাস করতে পারল না। অঙ্কে পেয়েছে বারো। চিন্তা করেন অবস্থাটা। ক্লাস সেভেনের অঙ্কে যোগ-বিয়োগ ছাড়া কিছু আছে?

আমি ফুফুকে সামলাবার জন্যে, যাতে হুঁট করে বাবুভাইয়ের সামনে না পড়ে যান–নিচে চলে গেলাম। ফুফু, আমাকে বারান্দার অন্ধকার কোণের দিকে নিয়ে গেলেন।

বাবার শরীর হঠাৎ করে এত খারাপ হল কী জন্যে? পরশু দেখে গেলাম ভালো মানুষ!

বয়স হয়েছে।

বয়সটয়স কিছু না। এ বাড়িতে বাবার যত্ন হয় না। এই বাড়িতে চাকর বাকরের যে যত্ন হয়, বাবার সে-যত্নটাও হয় না।

হবে না কেন?

কেন–সেটা আমি বলব কী করে? তোরা থাকিস, তোরা বুঝবি।

ফুফু, যত্ন ঠিকই হয়। শাহানা নিজে ভাত খাইয়ে দেয়।

কেন, শাহানা খাওয়াবে কেন? শাহানা কে? মেয়ের ঘরের নাতনী। লতায়পাতায় সম্পর্ক। ভাবীরা কেন খাওয়ায় না? আমি সবই বুঝি। কিছু বলি না। যখন বলব, ঠিকই বলব। কাউকে ছাড়ব না। তোরা আমাকে ভেবেছিস কি?

ফুফু, আপনি দাদাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন না কেন? মেয়ের কাছে যত্ন ভালো হবে।

তাই রাখব। এই যাত্রা রক্ষা হলে নিজের কাছে নিয়ে যাব।

সেটাই ভালো হবে।

ভালো হোক মন্দ হোক তা-ই করব। এই বাড়িতে বাবার কোনো যত্ন হয়? বড়োভাবীকে দেখলাম চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্চর্য! একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, এর মধ্যে মানুষ ঘুমায় কী করে!

ফুফু, আপনি গিয়ে দাদার পাশে বসেন।

এখন আর বসাবসি।–রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আর ছোটভাবীই-বা কোথায়? নাকি ডাকাচ্ছে বোধ হয়।

ছোটচাচী তো চিটাগাং গেছেন।

কবে গেল?

গতকাল। টেলিফোন করা হয়েছে, এসে পড়বেন।

দেখা কাণ্ড, এত বড়ো এক জন রোগী, আর বাড়ীর বউ ফন্ট করে চিটাগাং 56না বনা!

কাল দাদার শরীর ভালোই ছিল। হাঁটাহাঁটিও করেছেন।

চিটাগাং কী জন্য গিয়েছে জানিস কিছু?

ওনার ভাইয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে, মেয়ে দেখতে গিয়েছেন।

ফুফু, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ফরিদের জন্য একটা মেয়ে দেখলাম আজ সকালে। হাইকোর্টের জাস্টিসের মেয়ে।

কেমন দেখলেন?

মন্দ না।

নওয়াব ফ্যামিলির একটা দেখেছিলেন, সেটার কী হল? খাজা ওয়াসিউদ্দিন না গিয়াসউদ্দিনের নাতনী।

ফুফু, তার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বললেন, এইখানে একটা মেয়ে দেখলাম হলুদ রঙের শাড়ি পরা। দাদার ঘরে বসে আছে। মেয়েটা কে?

নীলু।

নীলু, কে?

আমাদের ভাড়াটের মেয়ে, আগেও তো দেখেছেন।

কই, মনে পড়ছে না তো। মেয়েটা দেখতে মন্দ না।

হুঁ।

পড়াশোনা কী করে?

খুব ভালো ছাত্রী। চারটা লেটার পেয়েছে ম্যাট্রিকে।

তাই নাকি? কোন কলেজে পড়ে।

বখশিবাজার কলেজে পড়ে।

ডাক তো দেখি মেয়েটাকে-কথা বলি।

কী কথা বলবে? তুমি বরং দাদার ঘরে গিয়ে বস।

তুই গিয়ে বল না ফুফু ডাকছে।

এখানে আসতে বলব?

হুঁ। চেয়ার দিয়ে যা, বসি এখানে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে।

চেয়ারে বসতে বসতে ফুফু ফিসফিস করে বললেন, প্রেম-ফ্রেম করে না তো আবার?

জানি না করে। কিনা।

করে নির্ঘাত, গরিবের মেয়েগুলি হাড়-বজ্জাত হয়।

ফুফুকে দেখে মনে হল বাবার প্রসঙ্গ আর কিছুই তাঁর মনে নেই।

নীলুকে পাওয়া গেল না। রমিজ সাহেব শুধু বসে আছেন। সারা রাতই সম্ভবত বসে থাকবেন। আমাকে বললেন, একটু মনে হচ্ছে বেটার।

আমার চোখে বেটার মনে হল না। দৃষ্টি উড়ান্ত। বেশ বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রদ্যোত বাবু বললেন, অক্সিজেন দিতে হবে। একটা অক্সিজেন ইউনিটের ব্যবস্থা করা দরকার। নাকি হাসপাতালে নিতে চান?

বড়োচাচা আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ উত্তরটা শুনতে চান আমার মুখ থেকে। তাঁর নিজের কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। আমি চুপ করে। রইলাম। বড়োচাচা বললেন, তোর বাবাকে বরং জিজ্ঞেস করে আসি, কি বলিস?

জিজ্ঞেস করে আসেন। ছোটচাচা কোথায়?

এইখানেই তো ছিল।

বড়োচাচা উঠে গেলেন। আমি দেখলাম শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শাহানার এটা অভ্যেস, সে পুরুষদের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারে। আমি তার কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, নীলু কোথায়?

চা আনতে গেছে।

চা হচ্ছে নাকি?

হুঁ! সবাই রাত জগবে, চা ছাড়া হবে কীভাবে?

চা হলে ভালোই হয়।

শাহানা শুকনো গলায় বলল, নীলুকে খোঁজ করছিস কেন?

আমি খোঁজ করছি না। ফুফু। ডাকছেন।

কেন?

আমি কী করে বলব?

আমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। শাহানা এল আমার পিছু পিছু সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই শাহানা বলল, আস্তে হাট, আমি দোতলায় যাব। একা এক ভয় লাগে।

তোমার তো ভয়টয় নেই বলেই জানতাম।

নিভে যাচ্ছে।

তাই কি?

হুঁ। তাছাড়া ছোটমামা সিঁড়ির কাছে কালোমতো কী একটা দেখেছেন।

কী? ভূত?

হতে পারে। মানুষের মৃত্যুর সময় অনেক অশরীরী জিনিস ভিড় করে।

আমি শব্দ করে হাসলাম। বারান্দা অন্ধকার। আলো থেকে আসবার জন্যেই হয়তো কিছুই চোখে পড়ছে না। শাহানা বলল, বড়ো ভয় লাগছে। তার কথা শেষ হবার আগেই কাছেই কোথাও একটা শব্দ হল। শাহানা জাপটে ধরল। আমাকে। তার গায়ে একটি হালকা মিষ্টি গন্ধ, যা শুধু মেয়েদের গায়েই থাকে। আমি চাপা গলায় বললাম, বাতাসে দরজা নড়ছে, ভূতটুত কিছু না। শাহানা সম্বিৎ পেয়ে ঝট করে সরে গেল। হুঁড়মুড় করে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের চৌকাঠ উঁচু, প্রচণ্ড একটি হোঁচট খেল সেখানে। আকবরের মা ছুটে এল রান্নাঘর থেকে, কী হইছে? কী হইছে গো?

শাহানা এরকম করল কেন কে জানে? আমি অচেনা-অজানা কেউ না। ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে কিছুই যায় আসে না। মেয়েরা প্রায় সময়ই মনগড়া অনেক ব্যাপারে কষ্ট পেয়ে অদ্ভুত আচরণ করে। শাহানা সেরকম মেয়ে নয়। সে খুব শক্ত ধরনের মেয়ে।

আমার ফুফু (মেজো) যখন মারা যান, তখন শাহানার বয়স মাত্র সাত। মেজে। ফুফা সে বছরই আবার বিয়ে করেন। বাবার বিয়ে মেয়েদের দেখতে নেই, কাজেই শাহানা সাময়িকভাবে মামাবাড়ি থাকতে এসে স্থায়ী হয়ে যায়। মা-মরা একটি মেয়েকে আদর-সোহাগ দেখাবার জন্যে এ বাড়ির সবাই ব্যস্ত ছিল। ছোটবেলায় শাহানার যত্ন দেখে আমি এবং বাবুভাই দারুণ ঈর্ষাবোধ করতাম।

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ সম্ভবত কষ্ট পাবার জন্যেই জন্মায়। টাকাপয়সার কষ্ট নয়, মানসিক কষ্ট। শাহানা সেই রকম একটি মেয়ে। তোর বিয়ে হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়।

ছেলে মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। জামিল হাসান। দারুণ ফুর্তিবাজ ছেলে। রাত দিন কোনো-না-কোনো বদ মতলব মাথায় ঘুরছে। এক বার মানুষের খুলি কালো সুতায় ফ্যানের হুঁকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। বড়োচাচা কি একটা কাজে ঘরে ঢুকে ভিরমি খেলেন, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙতে লাগল।

মুক্তিযুদ্ধের সেই মাসগুলি জামিল ভাইকে নিয়ে চমৎকার কাটছিল, কিন্তু এক দিন জামিল ভাই আর আসে না। কি একটা বই আনতে টিকাটুলি গিয়েছিল, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবে এরকম কথা।–কিন্তু তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। একটি লোক দিনে-দুপুরে হারিয়ে গেল।

জামিল ভাইয়ের জন্যে দীর্ঘ ন বছর অপেক্ষা করলাম। আমরা ন বছর পর আবার শাহানার বিয়ে দেওয়া হল। এবারের ছেলেটি গভীর প্রকৃতির। নিচু স্বরে কথা বলে। বইপত্রের পোকা। দাদার ছেলেটিকে অত্যন্ত পছন্দ হল। কিন্তু ছেলেটির হয়তো পছন্দ হল না। শাহানাকে, কিংবা অন্য কিছু। সে চলে গেল সুইডেনে, সেখান থেকে নেদারল্যাণ্ডে। মাঝে-মধ্যে হঠাৎ চিঠি আসত তার। যোগাযোগ বলতে এই পর্যন্ত। সেও আজ প্রায় চার বছর হতে চলল। শাহানা অত্যন্ত শক্ত ধাঁচের মেয়ে। সে কেঁদে বুক ভাসাল না, কিছুই করল না। এমনভাবে থাকতে লাগল, যেন এটাই স্বাভাবিক। আজ এরকম করল কেন? ভয় পেয়ে যদি আমাকে জাপটে ধরে তাতে এ৩টা বিচলিত হবার কী আছে? আমি বারান্দার অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবুভাইয়ের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বাবুভাই ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছে। ঘরে মিষ্টি গন্ধ। অন্ধকারে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। আমি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে ডাকলাম, বাবুভাই।

হুঁ।

সাবটা শেষ করে ফেলেছি নাকি?

হুঁ।

কী সর্ব্বনাশ।

সর্বনাশের কী আছে?

তুমি আজ একটা কেলেঙ্কারি করবে। বাবুভাই।

কেলেঙ্কারির কিছু নেই। তুই বাস, তোর সাথে কথা আছে।

আমি বসলাম। বাবুভাই শান্তস্বরে বলল, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার?

মিনিট দশেক আগে এই ঘরে এক জন কেউ এসেছিল। সামনের চেয়ারটায় বসেছিল।

কে সে?

চিনি না। বুড়ো মতো লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

অন্ধকারে তুমি খোঁচা খোঁচা দাঁটু দেখলে কীভাবে?

কীভাবে দেখলাম জানি না, তবে দেখলাম।

কতক্ষণ ছিল সে লোক?

খুব অল্প সময়।

আমি সিগারেট ধরিয়ে হালকা স্বরে বললাম, তোমার নেশা হয়েছে। আর খেয়ো না।

নেশা-টেশা হয় নি। এ লোকটাকে দেখার পরই বোতল শেষ করেছি। এর আগে যা খেয়েছি, তাতে একটা চড়ুই পাখিরও কিছু হয় না।

মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ?

না, ভয় পাইনি।

লোকটা কি চোখের সামনে মিলিয়ে গেল?

বাবুভাই কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, চা খাবে নাকি? চা হচ্ছে।

খেতে পারি।

বাম্বটা লাগিয়ে ফেলব বাবুভাই?

বাহু লোগাবি কেন?

তুমি যেমন ভূতটুত দেখা শুরু করেছ।

বাবুভাই হেসে উঠল। অন্ধকারে পা টিপে টিপে যেতে আমার নিজের একটু গা ছমছম করতে লাগল। মানুষের আদিমতম সঙ্গী ভয়, সুযোগ পেলেই কোন এক অন্ধকার গুহা থেকে উঠে আসে। আমাদের সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে দেয়। বারান্দায় পা রাখতেই বড়োচাচা চেঁচিয়ে উঠলেন, কে, কে?

চাচা আমি।

বারান্দার বাতি গেল কোথায়? একটু আগে বাল্ব দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

একটা বাল্ব এনে লাগা তো।

লাগাচ্ছি।

বড়োচাচা সিঁড়ি দিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নেমে গেলেন। বড়োচাচা ভয় পাচ্ছেন। কিসের ভয়?

রান্নাঘরে নীলুকে পাওয়া গেল। বিরাট এক কেতলি চা বানিয়ে চিনি ঢালছে।

নীলু।

জ্বি।

মগবাজারের ফুফু, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। একতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন, মোটামতো।

জ্বি, আমি চিনি।

সে চায়ের কেতলি হাতে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, আকবরের মার কাছে দাও না, নিয়ে যাবে।

আকবরের মা নিচে গেছে। আমি নিতে পারব।

বারান্দা খুব অন্ধকার, তাছাড়া ভূত দেখা গেছে। বাবুভাই একটা ভূত দেখেছে–বুড়োমতো একটা লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

নীলু কিছু বলল না। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম তার চোখ ভেজা।

কী হয়েছে রে?

কিছু হয় নি।

চোখে পানি। কেউ কিছু বলেছে নাকি?

জ্বি না। কে আবার কি বলবে?

হঠাৎ আমার মনে হল মগবাজারের ফুফুর যাদি নীলুকে পছন্দ হয়, তাহলে মন্দ হয় না। ফরিদ ভাই ছেলেটি ভালো। নীলু, সুখীই হবে। তাছাড়া সুখী হবার প্রধান কারণ হচ্ছে টাকা পয়সা, যা ফুফুদের প্রচুর আছে।

নীলু বললো, ফুফু, আমাকে কী জন্যে ডাকছেন জানেন?

জানি। তাঁর ছেলের জন্যে মেয়ে দেখছেন। সুন্দরী মেয়ে হলেই তিনি কথাবার্তা বলে দেখেন চলবে কিনা।

নীলু, শান্তস্বরে বলল, আমার মতো গরিব মেয়েদের আপনার ফুফু দেখবেন ঠিকই কিন্তু বিয়ে দেবার সময় বিয়ে দেবেন তাদের মতো একটা বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে।

আমি বেশ অবাক হলাম। কলেজে উঠে মেয়েটি কথা বলতে শিখেছে। নীলু চায়ের কেতলি হাতে নিচে নেমে গেল।

দাদার ঘরে ঢুকেই একটা হালকা অথচ তীক্ষ্ণ গন্ধ পাওয়া গেল। মৃত্যুর গন্ধ। আমার ভুল হবার কথা নয়। মা যে-রাতে মারা যান, সে-রাতে আমি মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিলাম। তিনি তখন দিব্যি ভালো মানুষ। অসুখ সেরে গেছে। দুপুরবেলা বারান্দায় খানিকক্ষণ বসেও ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা খবরের কাগজ পড়তে চাইলেন। খুঁজেপেতে ভেতরের দুটি পাতা পাওয়া

গেল। আমি দেখলাম তিনি মন দিয়ে সিনেমার পাতা দেখছেন; যে-রোগী সিনেমার পাতা পড়ে তার রোগ সেরে গেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি বিচলিত বোধ করতে লাগলাম। কেমন যেন অন্য রকম একটা গন্ধ ঘরে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ। মা বললেন, পাবদা মাছ খেতে ইচ্ছে করছে। টগর, তুই দেখিস তো পাবদা মাছ পাওয়া যায় কিনা।

আমি তার জবাব না দিয়ে বললাম, একটা গন্ধ পাচ্ছি মা?

কি রকম গন্ধ?

অন্য রকম, অচেনা।

অডিকেলন দিয়েছি। কপালে, তার গন্ধ বোধহয়।

অডিকেলনের মিষ্টি গন্ধের সাথে তার মিল আছে, কিন্তু অডিকেলন নয়। এ অন্য জিনিস। একটা অচেনা গন্ধ।

দাদাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে

দাদাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। কেমন যেন কুৎসিত। যেন কিছু একটা তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। কী সেটা–আত্মা? তিনি আবার আগের মতো টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন। চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর তাকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল কোনো কিছু চিনতে পারছেন না। যেন নিতান্ত অপরিচিত একটি জায়গায় হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। নিদারুণ একটি ভয়। কিসের জন্যে এই ভয়? কাকে ভয়?

ডাক্তার প্রদ্যোত বাবু চেয়ারের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ভঙ্গিটা কুৎসিত। ছোট শিশুদের মতো হা করে ঘুম। জিভটা আবার ক্ষণে ক্ষণে নড়ছে। রমিজ সাহেবকে দেখলাম না। তিনি সম্ভবত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন। বাবা নেমে এসেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের প্রতীক হিসেবে হাতে একটা পত্রিকা ধরে রেখেছেন। রোগীর কারণে নয়, বাবার উপস্থিতির জন্যেই সবাই কথা বলছে নিচু গলায়। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবা বললেন, তোমার ছোট ফুফু এখনো আসছেন না কেন খোঁজ নাও। (বাবা কখনো কাউকে তুই বলেন না। এবং যে-কোনো কথা এমনভাবে বলেন, যেন মনে হয় এটিই তাঁর শেষ কথা।)

আমি বললাম, আমাদের টেলিফোন ঠিক নেই।

আমি নিচে নামার আগেই ডাঃ ওয়াদুদকে টেলিফোন করে এসেছি। টেলিফোন ঠিক নেই কথাটা ভুল। না জেনে কিছু বলবে না।

বাবা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন, যেন কিছুই হয় নি। আমি পা টিপে টিপে চলে গেলাম তেতলায়। টেলিফোন বাবার শোবার ঘরে থাকে।

হ্যালো-ছোট ফুফু।

কে, টগর?

জ্বি।

বাবার অবস্থা এখন কেমন?

ভালো না। তুমি আসছ না কেন?

আমি তো সেই কখন থেকে কাপড়টাপড় পরে বসে আছি। দু বার টেলিফোন করলাম। রিং হয়, কিন্তু কেউ ধরে না।

আমরা সবাই নিচে, সেজন্যেই কেউ ধরে না। কাপড় পরে বসে আছ, আসছ না কেন?

তোমার ফুফার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এক জন কোরানে হাফেজকে আনতে গেছে। বাবাকে তওবা করাবে, দোয়াটোয়া পড়বে।

তওবা কী জন্যে?

মরবার আগে তওবা করতে হয় না?

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মরবার আগে যদি তওবা করতে হয়, তাহলে সেটা মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার মতো। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্যে সেটা নিশ্চয়ই একটা ভয়াবহ ব্যাপার। জেনে ফেলা যে, আর কোনো আশা নেই। এবার যাত্রা শুরু করতে হবে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। যে মারা যাচ্ছে, তার কাছ থেকে শেষ আশার মিটমিটি প্রদীপটি কেড়ে নেয়া খুব অমানবিক কাজ। তাকে দেখাতে হবে যে, আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। মৃত্যু নামক হিংস্র পশুর সঙ্গে পশুর মতোই লড়ছি। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। কে যেন সিঁড়ি বেয়ে আসছে।

বড়োফুফু এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ বিরক্তিতে কোঁচকান। গাল ঘামে চকচক করছে–একটা মাত্র ফোন, সেটা আবার তেতলায়। এই বাড়ির লোকদের বুদ্ধিসুদ্ধি আর কোনো কালেই হবে না।

কাকে ফোন করবেন?

বড়োফুপু তার জবাব না দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। কেউ সম্ভবত ধরছে না। তাঁর মুখ আরো কোঁচকাতে লাগল–এত বড়ো বাড়ি, টেলিফোন দুটো রাখা উচিত।

কেউ ধরছে না ফুফু?

নাহ।

মনে হয়। ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত একটা বাজে।

আমি বলে এসেছি জেগে বসে থাকতে। নবাবজাদা গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

ফুফু, আবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ইশারায় বললেন অপেক্ষা করতে। আমি চেয়ার টেনে বসলাম। লাইন পাওয়া গেল না। ফুফুর মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বললাম, আমাকে কিছু বলবেন?

হুঁ। ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বললাম।

কোন মেয়ে?

নীলু। মেয়েটাকে তো ভালোই মনে হল।

আপনার পছন্দ হয়েছে? পাশ করেছে পরীক্ষায়?

হাইট অবশ্যি কম, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মতো হবে। কী বলিস?

হতে পারে। মেপে দেখি নি কখনো।

দুই ইঞ্চি হিল পরলে ধরা যাবে না।

হুঁ।

মেয়েটার আঙুলগুলি একটু মোটা। ওয়ার্কিং ক্লাসের মেয়েদের মতো।

তাই নাকি, আমি লক্ষ করি নি।

বড়োফুফু বললেন, সব মিলিয়ো তো পাওয়া যায় না। এই মেয়েটির একটা অবশ্যই ভালো দিক আছে, ছোট ফ্যামিলির মেয়ে, মাথা নিচু করে থাকবে সব সময়। শব্দটাও করবে না। কী বলিস, ঠিক না?

অন্য রকমও হতে পারে। হয়তো ফোঁস করে উঠবে।

হুঁ।

গরিব আত্মীয়-স্বজনরা রাতদিন ভিড় করবে। স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে পাকা কাঁঠাল হাতে আপনার ড্রইগুরুমে এসে বসে থাকবে। পান খেয়ে এ্যাশট্রেতে পিক ফেলবে। নাক ঝাড়বে।

বড়োফুফু দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, মেয়েটির বাবা কী করে?

জানি না কী করে।

সে কি! তোদের ভাড়াটে, আর তোরা জানিস না কী করে?

ভাড়াটে-ফাড়াটে বোধ হয় না। দাদা থাকতে দিয়েছিলেন, চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাসে মাসে কিছু দিত।

বাড়ি কোথায়?

কে জানে কোথায়?

বাড়ি কোথায় সেটাও জানিস না?

উঁহু।

আমি মেয়েটিকে আমার মগবাজারের বাসায় যেতে বলেছি। বেড়াবার জন্যে।

আপনার তাহলে ভালোই পছন্দ হয়েছে।

বাড়ি কোথায়, সেটা না জেনে বেড়াতে যাবার কথা বলা ঠিক হয় নি।

একটি মেয়ে ভালো কি মন্দ, তার সাথে তার বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার সাথে বাজে তর্ক করিস না। বাজে তর্ক জীবনে অনেক শুনেছি। তোর কাছ থেকে না শুনলেও চলবে।

বড়োফুফু টেলিফোন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার বোধহয় লাইন পাওয়া গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি শুনলাম, বড়োফুফু, চেঁচাচ্ছেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ফাজলামির জায়গা পাস না। ছোটলোক কোথাকার। এক চড় দিয়ে...

চা আনতে গিয়ে কোথায় উধাও হলি?

চায়ের কথা আমার মনেই ছিল না। রাত জেগে শরীর খারাপ লাগছে। এসেছিলাম অন্ধকারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব ভেবে। বাবুভাই নিজেও দেখলাম শুয়ে আছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর। বাবুভাই ক্লান্ত স্বরে ব্রলাল, একটু যেন জ্বর জ্বর লাগছে রে।

বাবুভাই, তুমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিচে যাও।

নাহ।

না কেন?

কেউ মারা যাচ্ছে, এটা দেখতে ভালো লাগে না। অনেক বার দেখেছি।

আমি চুপ করে রইলাম। বাবুভাই নিচু গলায় বলল, মুখে আমরা অসংখ্য বার বলি মরতে তো হবেই, কিন্তু সত্যি সত্যি মৃত্যু যখন আসে তখন মনটন ভেঙে যায়।

বাবুভাই চাদর গায়ে উঠে বসল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমাদের হাতে এক বার বেলুচ রেজিমেন্টের এক নন-কমিশণ্ড অফিসার ধরা পড়ে গেল। হাবিলদার মেজর। ব্যাটাকে আমরা এগার মাইল হাঁটিয়ে মেথিকান্দা নিয়ে এলাম। ব্যাটার মনে কোনো ভয়ডর নেই। সিগারেট দিই। ভূসভূস করে টানে। চা দিয়েছি, শেষ করে আরেক কাপ চাইল। ব্যাটার সাহসের তারিফ করি মনে মনে।

নাম কী ছিল?

নাম মনে নেই। নাম দিয়ে দরকার কি?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

নাম বাহাদুর খাঁ। ঝিলামের এক গাঁয়ে বাড়ি। দুই ছেলে ছিল–এক জন মটর মেকানিক, অন্য জন নেভিতে।

ও।

এইসব আমি মনে করতে চাই না। নামধাম দিয়ে কী হয়?

আমি সিগারেট ধরলাম। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে ক্ষুধার সময় সিগারেট ভালো লাগে না। বমি-বমি লাগে। বাবুভাই বলল, মেথিকান্দা পৌঁছেই শুনি নতুন করে মিলিটারি রিইনফোর্সমেন্ট আসছে। আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। ঠিক করা হল, বাহাদুর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না।

মেরে ফেলা হবে?

হুঁ।

তারপর?

ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর এত বড়ো একটা সাহসী মানুষ ছরছর করে পেচ্ছাপ করে ফেলল, কথা জড়িয়ে গেল। উল্টা-পাল্টা কথা বলতে লাগল।

তারপর?

এর আবার তারপর কি?

বাবুভাই হঠাৎ রেগে গেল। তার সম্ভবত নেশা হয়েছে।

আমাদের অভ্যেসই হচ্ছে একটা তারপর খোঁজা। মৃত্যুর আবার তারপর কি?

আমি জবাব দিলাম না। বাবুভাই সিগারেটে টান দিয়ে খকখিক করে খুব কাশতে লাগল। কাশি থামলে কড়া গলায় বলল, আমি মরবার সময় এক জন সাহসী মানুষের মতো মরব।

লাভ কি তাতে?

লাভ-লোকসান জানি না। সব কিছুতে লাভ-লোকসান খোজা মানুষের আরেকটি অভ্যাস। বাজে অভ্যাস।

তুমি শুধু শুধু রাগছ, বাবুভাই।

শুধু শুধু রাগছি?

হুঁ।

টগর দেখ, তোকে আমি একটি কথা বলে রাখি–মারবার সময় আমি এক জন সত্যিকার সাহসী মানুষের মতো মরব। আরো এক জন বড়ো ডাক্তার আন, এই বলে হৈ-চৈ শুরু করব না।

ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম।

দরজার পাশে খুঁট করে শব্দ হল। বাবুভাই অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে? কে?

আমি, আমি শাহানা। অন্ধকারে কী করছ?

কিছু করছি না। তুমি কী চাও?

ভেতরে আসব?

না।

শাহনা চাপা স্বরে বলল, ঘর অন্ধকার করে বসে আছ কেন?

তাতে কারো তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শাহানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নানার জ্ঞান হয়েছে, তোমাকে খুঁজছে।

ঠিক আছে, যাব।

শাহানা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে গেলে ভালো হয়।

শাহানা নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বাবুভাই অস্পষ্ট স্বরে বলল, বেশ তেজী মেয়ে। ঠিক না?

হুঁ।

এক জন মেয়ে-মানুষের মধ্যে এরকম তেজ দেখা যায় না।

হুঁ।

বাবুভাই বিছানা থেকে নামল। ক্লান্তস্বরে বলল, শরীর খারাপ লাগছে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করব।

যা করবার তাড়াতাড়ি কর, দাদা তোমাকে ডাকছে।

তোকে আরেকটা কথা বলতে চাই। বেশ জরুরী।

পরে বলবে।

কথাটা শাহানা প্রসঙ্গে।

দাঁড়িয়ে থাকলেই বাবুভাই কথা বলবে। আমি নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম। শাহানা প্রসঙ্গে বাবুভাইয়ের কী বলার থাকতে পারে, তা ঠিক বোঝা গেল না। শাহানা সেই জাতীয় মেয়ে,

যাদের প্রসঙ্গে কারো কিছু বলার থাকে না। এদের চোখের দৃষ্টি হয় শীতল, হৃদয়ও থাকে। শীতল। এরা শান্ত ভঙ্গিতে সংসারের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের বুড়ো সম্রাট শাহজাহানের কাছে সারা দুপুর বসে থাকে জাহানারা সেজে। যখনই প্রয়োজন মনে করে, তখনি গলার স্বর অস্বাভাবিক শীতল করে আমাকে উপদেশ দিতে আসে। যেমন দিন সাতেক আগে হঠাৎ আমাকে এসে বলল, গতকাল নীলুর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল তোমার?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কেন?

দেখলাম নীলু। খুব হাসছে।

জোক বলছিলাম একটা। মজার গল্প।

কি জোক?

তার দরকারটা কী?

দরকার আছে। একটা কাঁচা বয়সের মেয়ে। ওর সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি করা ঠিক না।

অসুবিধাটা কোথায়?

অল্পবয়েসী মেয়েরা অতি সহজেই উইকিনেস গ্রো করিয়ে ফেলে এবং পরে কষ্ট পায়। গরিব-দুঃখী মানুষের মেয়ে, এদের নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক না।

তাই বুঝি?

হুঁ।

শাহানা আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে চলে গেল।

রাগে গা জ্বলতে লাগলো আমার।

ছোটফুফু চলে এসেছেন

ছোটফুফু চলে এসেছেন। সঙ্গে অল্পবয়স্ক মৌলবী এক জন। লোকটির মাথায় বেতের একটা টুপি। অত্যন্ত ফর্স একটা পাঞ্জাবি আছে গায়ে। (এই জাতীয় লোকদের গায়ে সাধারণত এত ফর্সা জামাকাপড় থাকে না।) পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেলের বদলে পরিষ্কার একজোড়া চটি জুতো। লোকটি বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে দেখে বোঝা যায়, কিছু একটা পড়ছে মনে মনে। আমাকে দেখে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বলল, আসসালামু আলায়কুম। ভালো আছেন?

আমি জবাব না দিয়ে দাদার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘর ভর্তি মানুষ। দাদা আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, কে? বাবু?

জ্বি-না, আমি টগর।

ও তুই। বাবু কই?

আসছে।

বড়োচাচা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, লাটসাহেবের হয়েছেটা কি? এতক্ষণ লাগে?

দাদা শান্ত স্বরে বললেন, চিৎকার করিস না। আসুক। ধীরেসুস্থে। তাড়া নেই কোনো!

ছোটচাচা বললেন, সন্ধ্যা থেকে তাকে দেখি না, সে আছে কোথায়?

দাদা ক্লান্ত স্বরে বললেন, আমার শখ ছিল বাবুর একটা বিয়ে দিয়ে যাই।

বড়োফুফু। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বাবু এখন বিয়ে করবে কি? রোজগারপাতি কোথায়?

দাদা বিরক্ত চোখে তাকালেন। বড়োফুফু বললেন, ফরিদের বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর বিয়েটা নিজে দাঁড়িয়ে দিয়ে যান। আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হলেই কথাবার্তা ফাইনাল করব। জাস্টিস বি. করিম সাহেবের ছোট মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে.....।

দাদা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাবু কোথায়? তাঁর ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, নিঃশ্বাস নিতে বোধহয় কষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে আবার।

দাদা বললেন, তোমরা কেউ একটা গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দাও।

ছোটফুফু, দৌড়ে রুমাল ভিজিয়ে আনলেন। প্রদ্যোত বাবু বললেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

অক্সিজেনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলেই আরাম হবে।

ডাক্তার, শান্তিতে মরতে দাও। ঝামেলা করবে না।

ছোটফুফু বললেন, এইসব কথা কেন বলছেন বাবা?

মা, সময় শেষ হয়ে এসেছে।

ছোটফুফু, চোখ মুছতে লাগলেন। বাবুভাই এলেন সেই সময়। দাদা হাত ইশারা করলেন। বসতে বললেন তাঁর কাছে। ক্লান্ত স্বরে বললেন, সবাই আছে। এইখানে? বড়োচাচী বললেন, জ্বি আছে। দাদা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন, ছোটন কোথায়?

ছোটন হচ্ছে আমার ছোটচাচী, দাদার খুব প্রিয়পাত্রী। বড়োফুফু, বললেন, ছোটন গেছে চিটাগাং। কী যে এদের কাণ্ড! এমন অসুখবিসুখের মধ্যে কেউ বাইরে যায়? ছোটচাচা বললেন, সে কাল আসবে। দাদা বললেন, কাল পর্যন্ত আমার সময় নেই। তোমরা কেউ গিয়ে আলমারি খোল।

বড়োফুফু বললেন, বাইরের লোকজন না থাকাই ভালো। এই মেয়ে, নীলু না তোমার নাম? তুমি বাইরে যাও।

দাদার ভ্রূকুঞ্চিত হল। তিনি কিছুই বললেন না। প্রদ্যোত বাবুও উঠে দাঁড়ালেন, আমি বারান্দায় গিয়ে বসছি।

আলমারি খোলা গেল না। বড়োচাচা এদিক-সেদিক নানাভাবে চাবি ঘোরালেন। দরজা ঝাঁকালেন। কিছুতেই কিছু হল না। দাদা ক্লান্ত স্বরে বললেন, তুই কোনোদিনই কিছু পারলি না। চাবিটা রহমানের কাছে দে।

বড়োচাচা চাবি দিলেন না। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলমারির দরজার গায়ে, যেন এটা খোলার উপর তাঁর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। দেখতে–দেখতে তাঁর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘম পড়তে লাগল। তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। বড়োফুফু, অধৈর্য হয়ে

বললেন, দেখি, চাবিটা দাও আমার কাছে। বড়োচাচা দিলেন না। চোখ ছোট করে তাকালেন। যেন কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছেন না। বাবুভাই বললেন, ফুফু, বাবাকে খুলতে দিন। বড়োফুফু। ফোঁস করে উঠলেন, সে এটা খুলবে কীভাবে? তার সে-বুদ্ধি থাকলে তো কাজই হত।

একটা সামান্য ব্যাপারে আবহাওয়া বদলে গেল। বড়োচাচা এমন করতে লাগলেন, যেন স্টীলের আলমারি খুলতেই হবে। আমি লক্ষ করলাম, তাঁর হাত কাঁপছে। ফুফু বিরক্তির একটা শব্দ করলেন। বড়োচাচার চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো হয়ে গেল। জীবনে তিনি অসংখ্য বার পরাজিত হয়েছেন, কখনো কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। আজ তাঁর এরকম হচ্ছে কেন কে জানে?

তুলনামূলকভাবে দাদা অনেক স্বাভাবিক। তিনি যেন কৌতূহলী হয়ে বড়োচাচার কাণ্ড লক্ষ করছেন। বড়োচাচা এক সময় ছুটে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দাদা লম্বা একটি নিঃশ্বাস ফেলে মিনুকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। মনে হল তিনি যেন স্পষ্ট দেখছেন মিনু ছোট ছোট পা ফেলে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। দাদা অবাক বিস্ময়ে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে দেখছেন। তিনি এক বার বললেন, কেমন আছ আম্মা বেটি?

বলার পরপরই দাদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন মেয়েটি চমৎকার কোনো উত্তর দিয়েছে। আমার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। বাবুভাই বললেন, ডাক্তার সাহেবকে ডাকা দরকার। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা হাঁপাতে শুরু= করলেন। অদ্ভুত একটা শিস দেবার মতো শব্দ হতে লাগল। প্রদ্যোত বাবু দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরে গাড়ির শব্দ হল। অক্সিজেন ইউনিট নিয়ে ওরা বোধহয় এসে পড়েছে। আমি বাবুভাইয়ের পেছন-পেছন ঘর

ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। মৌলবী লোকটি তখনো চেয়ারে ঠিক আগের মতো বসে আছে। দোয়াটোয়া পড়ছে হয়তো। তার ঠোঁট কাঁপছে দ্রুত ভঙ্গিতে। বাবুভাই কড়া গলায় বলল, কে আপনি?

লোকটি হকচকিয়ে গেল। বাবু ভাই দ্বিতীয় বার বলল, কে আপনি?

প্রশ্নের উগ্র ধরন দেখেই হয়তো লোকটি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, উনি এক জন কোরানে হাফেজ।

কোরানে হাফেজ? গোটা কোরান শরিফটা মুখস্থ করেছেন?

জ্বি জনাব।

কী উদ্দেশ্যে করেছেন?

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে করি নাই।

বাবুভাই বিরক্তির স্বরে বলল, এক সময় এটার দরকার ছিল। মুখস্থ করে মনে রাখতে হত, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। কোরান শরিফ পাওয়া যায়। বুঝলেন?

জ্বি, বুঝলাম। তবে জনাব, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে। আমি এক জনকে চিনতাম, সে একটা গোটা কবিতার বই মুখস্থ করেছিল।

বাবুভাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। লোকটি মৃদু স্বরে বলল, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে।

আপনি ঠিক বলেছেন। কিছু মনে করবেন না।

জ্বি না, কিছু মনে করি নাই।

আপনার নাম কি?

মোহাম্মদ ইসমাইল।

ইসমাইল সাহেব, আপনাকে চা দিয়েছে?

আমি চা খাই না।

আপনি কি আমার দাদার জন্য দোয়া করছেন?

জ্বি জনাব, করছি। আপনারাও করেন।

ইসমাইল সাহেব বসে পড়ল। অপূর্ব সুরেলা গলায় কোরান পড়তে শুরু করল। যার এত সুন্দর গলা, সে কেন এতক্ষণ মনে মনে পড়ছিল? বাবুভাই অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। শাহানাও ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। সে মাথায় কাপড় দিয়েছে। সে দেখলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বাবুভাইয়ের দিকে। যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করছে। ঘরের ভেতর থেকে দাদার গলা শোনা গেল। অন্য রকম আওয়াজ। শুনলেই মনে হয় তাঁর বুকের উপর

পাথরের মতো ভারি কিছু একটা চেপে বসেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা সরান যাচ্ছে না। ছোটফুফু, কাঁদতে শুরু করেছেন। এই প্রথম বোধ হয় এ বাড়ির কেউ কাঁদল। কান্না খুব ছোঁয়াচে, এক্ষুণি অন্য সবাই কাঁদতে শুরু করবে। আমাদের এ বাড়িতে কোনো শিশু নেই। কেউ এখানে কাঁদে না। দীর্ঘ দিন পর এ বাড়ির মানুষেরা চোখ মুছবে।

ছোটফুফু পাংশু মুখে বাইরে এসে বললেন, টগর, একটা জায়নামাজ দে তো, নিরিবিলিতে একটা খতম পড়বা।

আমি বললাম, ফুফা আসবেন না?

আসবে হয়তো। খবর পেয়েছে।

কোথায় বসে দোয়া পড়তে চান? তিনতলায় যাবেন? কেউ নেই। কিন্তু তিনতলায়।

তাতে কী হয়েছে?

ভয়টয় পেতে পারেন।

ভয় পাব। কী জন্যে? কী সব কথাবার্তা বলিস!

ছোটফুফু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমাদের এই বংশের সবাই অল্পতেই বিরক্ত হয়। অল্পতে রেগে ওঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ছোটফুপু বললেন, বাবা আজ রাত্রেই মারা যাবেন!

কেমন করে বলছেন?

ঘরে ঢুকেই আমার মনে হল। ঘরে মৃত্যু বসে আছে।

আমি চুপ করে রইলাম। ছোটফুফু বললেন, কবিরের এই দোঁহাটা পড়েছিস।

কোনটা?

জন্মের সময় শিশুটি কাঁদে, তার আশেপাশের সবাই আনন্দে হাসে। আর মৃত্যুর সময় যে মারা যাচ্ছে সে হাসে, অন্য সবাই কাঁদে।

কথাটা ঠিক নয় ফুফু।

ঠিক না? ঠিক না কেন?

যে মারা যাচ্ছে সে আরো বেশি কাঁদে। কেউ মরতে চায় না।

ছোটফুফু উত্তর দিলেন না। তবে তিনি বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে–তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। চোখ তীক্ষ্ণ।

তেতিলায় গিয়ে ফুফুর ভাবান্তর হল। আমার মনে হল তিনি একটুখানি ভয় পেলেন। আমাকে বললেন, উপরটা দেখি খুব চুপচাপ। কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জ্বি, সবাই নিচে।

তুই বারান্দায় একটু বসে থাক, দোয়াটা পড়তে আমার বেশি সময় লাগবে না।

ঠিক আছে, বসছি।

বারান্দায় এসে বসামাত্র রূপরূপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশে যে মেঘ করেছে লক্ষই করি নি। দমকা বাতাস দিতে লাগল। পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবার পর সিগারেট ধরান গেল। বসে থেকে শুনলাম, ছোটফুফু উঁচু গলায় কী-একটা দোয়া পড়ছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই ছোটফুফু ধর্ম-টর্মের দিকে অস্বাভাবিক ঝুঁকেছেন! দুই বার গিয়েছেন আজমীর শরিফ। মগবাজারের কোন এক পীর সাহেবের কাছে মুরিদ হয়েছেন। ঘোমটা ছাড়া কোথাও বের হন না। ধর্মে এই অস্বাভাবিক মতির পেছনের কারণ হচ্ছে আমাদের ছোটফুফা।

এক দিন খবরের কাগজে একটা বেশ রগরগে খবর ছাপা হল। তের বৎসরের বালিকা পরিচারিকা ধর্ষণের দায়ে গৃহস্বামী গ্রেফতার। প্রথম পৃষ্ঠায় পুরো দুই কলাম জুড়ে খবর। অর্ধেক পড়বার পর অর্থাৎকে উঠতে হল-গৃহস্বামী আমাদের ছোটফুফা। কোনো পরিচিত ব্যক্তির সম্পর্কে এই ধরনের খবর ছাপা হতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। কী সর্বনাশ!

ছোটফুফু দশটার দিকে এসে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র। ফুফা নাকি সে-রাতে সন্ধ্যা থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ছোটফুফু এত চোখের জল ফেলতে লাগলেন যে আমরা প্রায় বিশ্বাস করে ফেললাম ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দাদা গম্ভীর স্বরে বললেন, এ হারামজাদাটা যেন আমি জীবিত থাকা অবস্থায় এ

বাড়ি না। আসে। ছোটফুফু কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

দাদা বললেন, তুইও আসবি না এ বাড়িতে।

ফুফার কিছুই হল না। হবার কথাও নয়। ফুফাদের এত টাকা পয়সা যে, এইসব ছোটখাট জিনিস তাদের সম্পর্শ করতে পারে না। ঝামেলা হয়। গরিবদের। বড়োলোকদের ঝামেলা কী?

ফুফার সঙ্গে দেখা হলে দারুণ একটা অস্বস্তির ব্যাপার হবে, এই ভেবে আমি এবং বাবুভাই ধানমণ্ডি এলাকা দিয়ে যাওয়া-আসাই বন্ধ করে দিলাম। এর পরপরই খবর পেলাম, ছোটফুফা নাকি মগবাজারের কোন এক পীরের কাছে যাওয়া-আসা করছেন।

তেতলা থেকে নিচে নেমেই বাবুভাইয়ের দেখা পেলাম। তিনি ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে নিচু স্বরে কী-যেন বলছেন। ইসমাইল সাহেবের মুখটি হাসিহাসি। কোনো রসিকতা হচ্ছে কি? আমি কৌতূহলী হয়ে বাবুভাইয়ের পাশে দাঁড়াতেই ছোটচাঁচা পাংশু মুখে বাইরে এসে বললেন, ডাঃ ওয়াদুদকে এক বার নিয়ে আসা দরকার। বাবু, তুই গাড়ি নিয়ে যা। উনি বলেছেন অবস্থা খারাপ হলে ডাকতে। বাসা চিনিস তো?

চিনি।

ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ডেকে তোলে। ঘুমের কারোর আর মা-বাপ নাই দেখি। টগরকে সঙ্গে নিয়ে যা।

বাবুভাই ড্রাইভারকে ডাকল না। নিজেই গাড়ি বের করল। ভারি গলায় বলল, কটা বাজে দেখ তো।

একটা পঁয়ত্রিশ।

বাবুভাই সাধারণত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায়, কিন্তু জনশূন্য রাস্তাতেও তাঁর গাড়ি চলেছে খুব ধীর গতিতে। যেন কোনো তাড়া নেই। একসময় পৌঁছলেই হল। বাবু ভাই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, তোকে একটা কথা বলছি। শাহানা প্রসঙ্গে।

পরেও বলতে পোর।

না, আজই বলা দরকার। আজকের রাতটা একটা বিশেষ রাত। সবার মন দুর্বল। আমার নিজেরও দুর্বল। আজ রাতে বলা না হলে কোনো দিনই বলা হবে না।

ঠিক আছে, বল।

বাবুভাই গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরাল। দু টান দিয়ে সেটি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিচু গলায় বলল, বছর দুই আগে এক দিন দুপুরবেলা শাহানা আমার ঘরে এসেছিল। তুই তখন ময়মনসিং। শাহানা এসেছিল ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারি নিতে।

তারপর?

আমি শাহানাকে বললাম দরজাটা বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসতো। সে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাবুভাই চুপ করে গেল। আমি বললাম, এই পর্যন্তই?

না, এই পর্যন্তই না। আমি উঠে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম। শাহানা চিৎকার করল না, হুঁটোপুটি করল না, কিছুই করল না। তার চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়তে কাঁড।

আমি বললাম, আর কিছু না, এ পর্যন্ত?

আর কিছু নেই, এই পর্যন্তই।

বাবুভাই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, শাহানাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি ঠিক করেছি, শাহানাকে এই কথাটি বলব।

আজই বলবো?

হুঁ। আজই বলব।

আজ না বলে দিন দশেক পরা বল।

দিন দশেক পরে বললে কী হবে?

শাহানার হাসবেণ্ড লোকটি আগামী সপ্তাহে ফিরে আসছে।

কে বলেছে?

আমি নীলুর কাছে শুনেছি। শাহানা নীলুর সঙ্গে অনেক গোপন কথাটথা বলে।

বাবুভাই দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, এ লোকটি আসুক বা না-আসুক আমার কিছুই যায় আসে না, আমি আজ রাতেই বলব।

ঠিক আছে, বলবে। রেগে যাচ্ছ কেন?

বাবুভাই অকারণে হর্ণ টিপতে লাগল। আমি বললাম, তোমার এই ঘটনার কথা আর কেউ জানে?

জানি না। সম্ভবত দাদা জানে। শাহানা হয়তো তাঁকে বলেছে।

সেকি।

হ্যাঁ। সে দাদাকে বলেছে।

তুমি বুঝলে কী করে?

আমি কচি খোকা না।

বাবুভাই হুঁ হুঁ করে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

দাদাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে

ডাঃ ওয়াদুদকে নিয়ে ফিরলাম রাত আড়াইটার দিকে। এসে দেখি দাদাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মুখের শিরাগুলি নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। রমিজ সাহেব দাদার বিছানার পাশে তসবি হাতে বসে আছেন। এই ভড়ৎ-এর কী মানে? দোয়া-দরুদ যদি পড়তেই হয়, তাহলে মনে মনে পড়লেই হয়। লোকদেখান একটা তসবির দরকার কি? আমি তাকিয়ে দেখলাম রমিজ সাহেব তাঁর মুখ দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট করে রেখেছেন। দাদা মারা গেলে সবচেয়ে উঁচু গলায় যে তিনি কাঁদবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকটি নিবেধি। এ-রকম একটি নিবেধি লোকের বাচ্চাগুলি এ-রকম বুদ্ধিমান হয়েছে কীভাবে কে জানে? সব কটি বাচ্চার এমন বুদ্ধি। বিশেষ করে ক্লাস সেভেনে পড়ে যে-মেয়েটি-বিলু। সব সময় একটা না একটা মজার কথা বলে। হাসি চেপে রাখা মুশকিল। মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করা দূরে থাকুক, রসিকতা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। কিন্তু বিলু খুব রসিক।

কয়েক দিন আগে সে বারান্দায় বসে কী-যেন বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই বলল, বলুন তো পাঁচ থেকে এক বাদ গেলে কখন ছয় হয়? আমি উত্তরের জন্যে আকাশপাতাল হাতড়াচ্ছি–সে গম্ভীর হয়ে বলল, পারলেন না তো? যখন ভুল হয়, তখন হয় ছয়।

আমার প্রায়ই মনে হয়, একটা নিবেধি অপদার্থ বাবার জন্যে সব কটি মেয়ে এখন কষ্ট পাচ্ছে, ভবিষ্যতেও পাবে।

রমিজ সাহেব আমাকে দেখে হাসিমুখে (তাঁর মুখ সব সময়ই হাসি—হাসি। নিবোধ লোকদের মুখ সব সময় হাসি-হাসি থাকে।) এগিয়ে এল।

ভাই সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল।

বলুন, শুনি।

চলেন, একটু বাইরে যাই।

বাইরে যাবার দরকার কি? এখানেই বলুন।

রামিজ সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। ধার চাইবার ভঙ্গি। কিন্তু রামিজ সাহেব আমাকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ আনলেন।

কথাটা নীলুর প্রসঙ্গে।

নীলুর প্রসঙ্গে কী কথা?

নীলুর একটা ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসছে, ছেলে টাক্সেশান অফিসার। ময়মনসিংহে নিজেদের বাড়ি আছে।

ভালোই তো, বিয়ে দিন।

দিতেই চাই। কিন্তু নীলু রাজি না। এখন যদি ভাই আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন.....।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি বলব কী জন্যে? আমি কে?

রামিজ সাহেব আমতা-আমতা করতে লাগলেন, না, ইয়ে মানে–

আশ্চর্য, মেয়ে রাজি হচ্ছে না সেটা আমাকে বলছেন কী জন্যে?

রমিজ সাহেবের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। তবু তিনি দেতে হাসি হাসতে লাগলেন। গা জ্বলে যাবার মতো অবস্থা। আমি গলার স্বর আর এক ধাপ উঁচু করে বললাম, শোনেন রমিজ সাহেব, সব কিছুর একটা সময়-অসময় আছে। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, এই সময় আপনি আজগুবি কথাবার্তা শুরু করলেন। আশ্চর্য!

রমিজ সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। দুর্বল লোকের উপর কঠিন হতে ভালো লাগে। তার উপর এই লোকটিকে আমি পছন্দ করি না। কড়া-কড়া ধরনের কথা বলার সুযোগ পেয়ে অঘূমজনিত ক্লান্তি আমার অনেকখানি কমে গেল। রামিজ সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আচ্ছা ভাইসব, যাই তাহলে।

যান।

রমিজ সাহেব গেটের কাছে চলে গেলেন। সেখানে আগুনের একটা ফুলকি জ্বলে উঠতে দেখা গেল। বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা ধরিয়েছেন। এতটা কড়া না। হলেও চলত বোধ হয়। কিন্তু লোকটিকে আমি সহ্য করতে পারি না। এক দিন দুপুরে তাকে দেখলাম মীরপুর রোডের কাছে এক রেস্টুরেন্টে বসে খুব তরিবত করে মোরগপোলাও খাচ্ছে। ছুটির দিন। সকালেও তাকে বাসায় দেখে এসেছি। আমি এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার রমিজ সাহেব, বাইরে খাচ্ছেন যে?

রামিজ সাহেব আমতা-আমতা করে যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে–তাঁর গ্যাষ্টিকের প্রবলেম আছে। খিদে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা খেতে হয়। বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে তাই... ..।

গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেমে পোলাও-টোলাও চালাচ্ছেন?

রামিজ সাহেব তার উত্তর দিলেন না। আরো এক দিন তাঁর সঙ্গে এরকম দেখা! রিকশা করে যাচ্ছি, দেখি এলিফ্যান্ট রোডের এক কাবাব-ঘরের সামনে খোলা জায়গায় চেয়ারে পা তুলে বসা। তাঁর সামনে দু-তিন ধরনের কাবাব। আমি রিকশা থেকেই চৌচালাম, এই যে রমিজ সাহেব। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিনই নীলু। এল টাকার জন্যে। এটা তার প্রথম আসা নয়, আগেও অনেক বার এসেছে। ধার চাইতে আসার লজ্জায় তাঁর ফর্স মুখ লালাভ। চোখ দেখেই মনে হয় আসার আগে ঘরে বসে খানিকক্ষণ কানাকাটি করেছে। চোখ ফোলা–ফোলা। আমি লজ্জা কমাবার জন্যেই বললাম (এই সময় আমি তুই করেই বলি), তোর যন্ত্রণায় তো সঙ্গে টাকা পয়সা রাখাই মুসিবত। কত টাকা দরকার?

দুই শ। যদি না থাকে-এক শ...

দেখি পারা যায় কিনা। পড়াশোনা হচ্ছে ঠিকমতো?

জ্বি।

গুড। এখন যা, রান্নাঘর থেকে দুধ-ছাড়া হালকা লিকারে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে ভেবে দেখি টাকা দেওয়া যায় কি না।

নীলু যেন পালিয়ে বাঁচে। চা নিয়ে এসে অনেকখানি সহজ হয়। এবং চায়ে চুমু দিয়ে আমি প্রতিবারের মতোই গম্ভীর হয়ে ভাবি, রমিজ সাহেব কি ইচ্ছা করেই মেয়েকে আমার কাছে পাঠান? তাঁর কি এক বারও মনে হয় না যে, আমি নীলুকে অনায়াসেই বলতে পারি, টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দে তো নীলু। আমি কোনো মহাপুরুষ নই। পৃথিবীর কোনো পুরুষই নয়। মহাপুরুষদের পাওয়া যায় ধর্মগ্রন্থে।

যে-লোক ভোর হতেই মেয়েকে টাকার জন্যে পাঠায়, সে কী করে আগের রাতে পায়ের উপর পা তুলে চপ-কাটলেট খায়! আমি নীলুকে বললাম, তোর বাবাকে প্রায়ই দেখি বাইরে হেভি খানাপিনা করে। নীলু। নরম গলায় বলল, প্রায়ই না, মাঝে মাঝে।

ঘরের খাওয়া রোচে না বুঝি?

নীলু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাবার ভালো খাওয়া খুব পছন্দ। ঘরে তো আর এইসব করা সম্ভব না। তাই কখনো কখনো.....

তাই বলে বক রাক্ষসের মতো একা-একা খাবে?

নীলু চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, আমাদের এইসব খেতে ইচ্ছেও করে না। এক বার বটি-কাবাব না। কী যেন এনেছিলেন, একগাদা লবণ। মুখে দেওয়া যায় না!

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, তোদের চার কন্যাকে আমি এক দিন ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব।

সত্যি?

হুঁ।

কবে নোবেন?

আগে থেকে দিন-তারিখ বলতে হবে নাকি? ভাগ।

আমাদের যেতে দেবে না।

সেটা দেখা যাবে।

সবাইকে নিয়ে অবশ্য যাওয়া হল না। নীলুকে নিয়ে গেলাম। সেটাও হঠাৎ করে। হাতির পুলের কাছে নীলুর সঙ্গে দেখা। সে একগাদা বই বুকের কাছে ধরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে হাঁটছে। আমি রিকশা থামিয়ে গলা বের করলাম, এই নীলু, যাস কই?

বাসায় যাই, আর কোথায় যাব? এই দিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে!

উঠে আয়।

আপনি বাসায় যাচ্ছেন?

সেটা দেখা যাবে, তুই ওঠ তো।

নীলু উঠে এল।

রোজ এই রোদের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি যাস?

রোজ না। যেদিন আমাদের গাড়িটা নষ্ট থাকে কিংবা ড্রাইভার আসে না সেদিন যাই।

নীলু, শাড়ির অচল দিয়ে মুখ মুছল।

কলেজে গিয়ে খুব কথা শিখেছিস দেখি! আয়, তোকে একটা ক্লাশ ওয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই।

এখন?

হুঁ।

আজ তো যাওয়া যাবে না।

আজ কী অসুবিধা?

আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন। আম্মার স্যাণ্ডেল নিয়ে এসেছি। এইগুলি পরে কেউ কোথাও যায়? আমাকে মনে করবে আপনার কোনো চাকরানী।

ঠিক আছে, আয় স্যাণ্ডেল কিনে দিই।

নীলু, শাড়ির অচল দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ক্লান্ত স্বরে বলল, আপনাদের খুব মজা, না? যখন যা ইচ্ছা হয় কিনতে পারেন।

তা পারি।

টাকা খরচ করতেও আপনি ওস্তাদ।

তাও ঠিক।

হঠাৎ এই নতুন স্যাণ্ডেল নিয়ে গিয়ে বাসায় কী বলব? আপনি দিয়েছেন, এই কথা বলব?

বলতে অসুবিধা কী?

অসুবিধা আছে, আপনি বুঝবেন না।

নীলু আবার কপালের ঘাম মুছল।

স্যাণ্ডেল কিনতে হবে না, যেটা আছে সেটা পরেই যাব।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তোদের মেয়েদের মধ্যে শুধু প্যাঁচ।

মেয়েদের মনের সব কথা আপনি জানেন, তাই না?

তা জানি।

জানাই তো উচিত, এত মেয়ে বন্ধু আপনার। সেদিন দেখলাম রিকশা করে একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছেন।

নীলু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

দূর থেকে দেখলাম

দূর থেকে দেখলাম, ছোটচাচার সঙ্গে মগবাজারের ফুফুর কী নিয়ে যেন লেগে গেছে। বড়োফুফু উত্তেজিত হয়ে কী সব বলছেন। ছোটচাচা তেমন সাড়াশব্দ করছেন না।

ছোটচাচার স্বভাব মিনমিনে। আড়ালে-আড়ালে থাকাই তাঁর স্বভাব। গলার স্বর উঁচু করে কিছু বলতে পারেন না। সব সময় ভীত-সন্ত্রস্তাভাব। যেন মহা কোনো অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাদের গেঞ্জির মিলের দায়িত্ব কিছু দিন ছিল তাঁর উপর। লোকসান-টোকসান দিয়ে এমন অবস্থা করলেন যে শেষ পর্যন্ত মিল বিক্রি করে দিতে হল। এখন কী-যেন একটা ব্যাবসা করেন। এবং মনে হয়। ভালোই টাকা পয়সা আয় করেন। ছোটচাচার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বৎসর। কোনো ছেলেপূলে হয় নি। ছোটচাচী যথেষ্ট সুন্দরী, তবু সারাক্ষণ সাজসজ্জা করেন। তাঁকে যখনই দেখা যাবে তখনি মনে হবে এই বুঝি কোনো পার্টিতে যাচ্ছেন। কিংবা কোনো বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে এলেন। বাবুভাইয়ের ধারণা ছোটচাচীর জন্যেই চাচা এতটা মিনমিনে হয়েছেন। কথাটা পুরোপুরি অসত্য নয়।

চাচা এ বাড়িতে থাকেন ছায়ার মতো। ছোটচাচী থাকেন হৈ-চৈ করে। সর্ব্বক্ষণই তাঁর কাছে গেষ্ট আসছে। এক বার শোনা গেল, কোন এক গুপ থিয়েটারের হয়ে তিনি নাকি নাটক করবেন। তাঁর ভূমিকা হচ্ছে মোড়লের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর। ছোটচাচী নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে এনে মুখস্থ করলেন। নাটক অবশ্যি হল না। দাদা ভেটো দিয়ে সব ভেঙে দিলেন।

মগবাজারের ফুফু, ছোটচাচার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো গোপন আলাপ করছিলেন, কারণ আমাকে দেখেই কথাবার্তা থেমে গেল। আমি বললাম, কী নিয়ে আলাপ করছিলেন আপনারা?

ছোটচাচা মিহি স্বরে বললেন, তেমন কিছু না।

বড়ফুফু, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, মা-র গয়না নিয়ে আলাপ করছিলাম, এমন গোপন কিছু না।

কী গয়না?

মা-র প্রায় দেড় শ ভরি গয়না আছে। সব বাবা স্টীলের আলমারিতে তুলে রেখেছেন।

তাতে কী হয়েছে?

গয়নাগুলি সব আছে কিনা আলমারি খুলে দেখা দরকার। গয়নাগুলিতে আমাদের দাবি আছে। স্মৃতিচিহ্ন।

আমি চুপ করে রইলাম। বড়োফুফু থেমে থেমে বললেন, গয়নার পুরো হিসাব থাকা দরকার। ছোটচাচা বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, আমি একটু বাবার ওখানে গিয়ে বসি।–বলেই প্রায় পালিয়ে গেলেন।

বড়োফুফু। থমথমে স্বরে বললেন, এটা এমন মেনা বিড়াল যে, এর মাথায় কাঁঠাল ভাঙলেও বুঝতে পারবে না।

কে ভাঙবে কাঁঠাল?

তোর বাবা, আর কে? আমি কি কিছু বুঝতে পারি না? ঠিকই পারি।

আমি চুপ করে গেলাম। বড়োফুফু, বললেন, খোঁজ নিয়েছিলি?

কি খোঁজ নেব?

মেয়েটার বাড়ি কোথায়। বাবা কী করে।

ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারেন।

আমি পারলে আর তোকে জিজ্ঞেস করি কেন?

মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে?

হুঁ। শাহানা বলল খুব নাকি লক্ষ্মী মেয়ে।

তা লক্ষ্মী বলতে পারেন।

আর শোন, ওদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দরকার।

আজ রাতেই দরকার?

অসুবিধা কি?

শাহানাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

না, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। মেয়েকে দিয়ে কোনো মেয়ের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে নেই। ঠিক খবর পাওয়া যায় না।

ঠিক আছে।

আর মেয়েটির একটা ছবি দরকার। ফরিদকে পাঠাব।

এই সব আমাকে বলছেন কেন?

কাকে বলব। তাহলে?

শাহানাকে বলেন, কিংবা বড়োচাচীকে বলেন।

বিয়ে-শাদির ব্যাপারে শাহানাকে জড়াতে চাই না! মেয়েটা অলক্ষুণে। আর তোর বড়োচাচীর কথা আমাকে কিছু বলিস না। ওর মাথায় কিছু আছে নাকি? মেয়েমানুষের এত কম বুদ্ধি থাকে, তা বড়োভাবীকে দেখেই প্রথমে জেনেছি, বুঝলি?

গেট খোলার শব্দে তাকিয়ে দেখি, ছোটফুফা এসে ঢুকছেন। গাড়ি গেটের বাইরে রাখা। ছোটফুফা কখনো গাড়ি ভেতরে ঢোকান না। ঢোকালে নাকি রের করতে সময় লাগে। ছোটফুফা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, বাবার অবস্থা কি?

বেশি ভালো না।

ক্লিনিকে ট্রান্সফার করা দরকার। পিজির ডাক্তার আমিনের সঙ্গে কথা বলেছি। কেবিনের অসুবিধা হবে না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার জামাল সাহেবের কথা বলতেই মন্ত্রের মতো কাজ হল। দেশের যে কী অবস্থা! রেফারেন্স ছাড়া কাজ হয় না। আপা, আপনি কেমন আছেন?

ভালো। তুমি কেমন?

আর আমি! আমার কথা কে জিজ্ঞেস করে বলেন? একটা পাটির সঙ্গে কথা বলার জন্য কোরিয়া গিয়েছিলাম। খাওয়াদাওয়ার কি যে কষ্ট আপা!

তাই বুঝি?

আর বলেন কেন। খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়ে জাপান ভালো। রাইস এবং চিকেনকারী পাওয়া যায়। এক্সেলেন্ট টেষ্ট।

ছোটফুফার কথাবার্তায় আমার গা জ্বালা করতে লাগল। এই লোকটি একটি মরণাপন্ন রুগী দেখতে এসে কোরিয়া-জাপান করছে। আমি বললাম, ছোটফুফা, আমি দোতলায় আছি। দরকার হলে ডাকবেন।

এই দাঁড়াও, আমিও যাব।

আপনি দাদাকে দেখে আসেন।

চট করে দেখেই আসছি। তুমি দাঁড়াও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটফুফা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। চোখ কপালে তুলে বললেন, অবস্থা তো বেশ খারাপা!

খারাপ তো বটেই।

রাত কাটবে না। কি বল?

না কাটারই কথা।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডাক্তারদের সার্কেলে আমার ভালো যোগাযোগ আছে। একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা দরকার।

আমি ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, বাবাকে বলেন। বলে নিয়ে যান।

ছোটফুফা চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মাথায় বাবুভাই দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দা অন্ধকার বলে তার মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। ছোটফুফা বললেন, বাবু নাকি? সব অন্ধকার করে রেখেছি কেন?

বাবুভাই জবাব দিল না। ফুফা বললেন, চল, তোমাদের ঘরে গিয়ে বসি।

আমাদের ঘরে বাতি নেই।

বাতি লাগবে না, তোমরা আছ তো?

বাবুভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি থাকব না। টগরকে বলে দেখেন।

আরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরে ঢুকেই ফুফা চাপা গলায় বললেন, কিসের গন্ধ? গন্ধ পাচ্ছে না? আমরা জবাব দিলাম না। বাবুভাই বললেন, কি বলতে চাচ্ছিলেন যেন?

আমার শ্বশুর সাহেব সম্পর্কে। শুনলাম তাঁর গ্রামের বাড়ি এবং বিশ বিঘা জমি নাকি স্কুল আর কলেজ ফাণ্ডে দিয়ে যাচ্ছেন?

জানি না, দিতে পারেন।

কি আশ্চর্য, তাকে গ্রামের লোকে দালাল বলে, আর তাদের জন্যে এটা করার মানে?

দালালী করেছিলেন, কাজেই দালাল বলে। সেই জন্যে দান-খয়রাত করবেন না?

আরে–তুমি বুঝতে পারছি না, দানটা অপাত্রে হচ্ছে না?

অপাত্রে হবে কেন? গ্রামের গরিব মানুষেরা পাবে।

দান-খয়রাত যোগ্য পাত্রে হওয়া উচিত। ওরা কী বলবে জান? ওরা বলবে, নাম কামাবার জন্যে করেছে। বলবে এবং শালা দালাল বলে গালি দেবে।

দিক না। দাদা তো আর শুনবে না। সে তো ভোগেই যাচ্ছে।

ফুফা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, এক জন মানুষ মারা যাচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে এ রকম অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলা তোমরা! আশ্চর্য!

শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার না। যেটা সত্যি সেটা বললাম।

মদের গন্ধ পাচ্ছি, মদ খাচ্ছিলে নাকি?

জ্বি, তা খাচ্ছিলাম।

আমি তাদের দু জনকে সেখানে রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, দু জনে এবার লেগে যাবে। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। খোলা ছাদে বসে একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিছু ভালো লাগছে না।

বাড়ির ছাদ

আমাদের এ বাড়ির ছাদটি শুধু যে সুন্দর তাই নয়, অপূর্ব! এর পেছনের সমস্ত কৃতিত্বই শাহানার। ফুলের টব এনে ফুল ফুটিয়ে এমন করেছে যে ছাদে না-ওঠা পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারবে না কত বড়ো বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সমস্ত ছাদকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাগের নাম গোলাপকুঞ্জ। গোলাপকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বসার জন্যে গদিওয়ালা মোড়া। বৃষ্টির আগে তা ভেতরে নিয়ে আসা হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

আমি ছাদে পা দিয়েই দেখলাম গোলাপকুঞ্জের একটি মোড়াতে বাবা বসে আছেন। তাঁকে দেখেই চট করে নিচে নেমে যাওয়া যায় না। আবার ছাদে ঘোরাঘুরিও করা যায় না। আমি হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় বারি। বাবা বললেন, টগর, নিচের কোনো খবর আছে?

জ্বি-না।

আস এদিকে।

বাবা পাইপ ধারালেন। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে এসে বস, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

আমি এগিয়ে গেলাম। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মা মারা যাবার পর আমি খানিকটা লোনলি হয়ে পড়েছি। এই বয়সে মানুষের সবচে বেশি কম্প্যানি প্রয়োজন।

জ্বি, তা ঠিক।

বস তুমি এখানে।

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসলাম।

তোমার রেজাল্ট হচ্ছে কবে?

ঠিক জানি না।

বাবা গম্ভীর হয়ে পাইপ টানতে লাগলেন। দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় পাই। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা মুশকিল। বাবা হঠাৎ নরম স্বরে বললেন, তোমরা আমাকে এড়িয়ে চল। কী কারণ বল তো।

আমি কুলকুল করে ঘামতে লাগলাম।

তোমার দাদারও এই অবস্থা ছিল। এ সংসারে কিছু মানুষকে একা একা থাকতে হয়–এটা ঠিক না।

আমি সাড়াশব্দ করলাম না।

তোমার দাদার অবস্থা কেমন দেখলে?

বেশি ভালো না।

তাঁর কাছে কে আছেন?

বড়োচাচা আর ছোটচাচা এই দু জনকে দেখে এসেছি।

বাবা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গতকাল খবর পেয়েছি, তোমার ছোটচাচা চিটাগাং-এ একটা বাড়ি করেছেন। আমি কিছুই জানতাম না। লুকানর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি কথা বললাম না। বাবা যখন কারো সঙ্গে কথা বলেন তখন কথা বলার ব্যাপারটা তিনিই সারেন, অন্যদের শুধু শোনার দায়িত্ব।

তোমাদের দাদা মারা যাবার পর বড়ো ধরনের ঝামেলা শুরু হবে। তোমার ফুফুরা খুব হৈ-চৈ করবে। বাবা ওদের সম্পত্তি বা টাকা পয়সা কিছুই দিয়ে যান নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মাস তিনেক আগে উইল করা হয়েছে। তোমার দাদার এ বিষয়ে লজিক খুব পরিষ্কার। তোমার ফুফুদের বিয়ের সময় বাড়ি দেওয়া হয়েছে। ক্যাশ টাকাও দেওয়া হয়েছে। জান নিশ্চয়ই?

জ্বি, জানি।

অবশ্যি এসব কিছুই তাদের মনে থাকবে না। দু জনেই হৈ-চৈ করবে। দু জনেই বলবে ইচ্ছে করে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কেইস-টেইস হওয়াও বিচিত্র নয়।

আমি উসখুস করতে লাগলাম। চট করে উঠে যাওয়া যাচ্ছে না। আবার বসেও থাকা যাচ্ছে না। এসব শুনতে ভালো লাগছে না।

আপনি কি চা-টা কিছু খাবেন?

নাহ।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীত-শীত লাগছে। আমি বললাম, নিচে যাই, দেখি কী হচ্ছে।

বস একটু! আমি বসে রইলাম। বসেই রইলাম। বাবা ক্লান্ত স্বরে বললেন, কয়েক দিন আগে তোমার মাকে স্বপ্ন দেখলাম। খুব কান্নাকাটি করছিল। তুমি তাকে স্বপ্নে দেখ।

জি-না।

স্বপ্নটা কেন যে দেখলাম! স্বপ্নের কোনো মানে থাকে কিনা কে জানে?

স্বপ্নেপুর কোনো অর্থ নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই।

বোধ হয় তাই। আজকাল আমি তোমার মায়ের কথা প্রায়ই ভাবি।

আমি চুপ করে রইলাম। একবার ভাবলাম বলি।–ভাবেন নাকি? বললাম না। অনেক কিছু, যা বাবাকে বলতে ইচ্ছে করে, তা শেষ পর্যন্ত বলা হয় না। বাবাও বোধ করি অনেক কিছু বলতে চান, শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলেন না।

তোমার দাদা তোমার মাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

জানি।

সাবটা জান না! তোমার যখন জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, তখন তোমার দাদা অন্য মানুষ!

ও।

তোমার মার বিয়ে হয় তের বছর বয়সে। আমার সঙ্গে নানা কারণে তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। সে ছিল ঘরোয়া ধরনের মেয়ে। মেয়েলিপনা ছাড়া তার মধ্যে কিছু ছিল না।

বাবা কথা বন্ধ করে খুক খুক করে খানিকক্ষণ কাশলেন।

তোমার মাকে আমি পছন্দ করি নি। সে রাত-দিন কাঁদত। তোমার দাদা তাকে আদর দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। সে যে কী অসম্ভব আদর, চোখে না। দেখলে বোঝা যাবে না। তোমার মা এক বার কমলা খেতে চেয়েছিল। বাবা এক গরুর গাড়ি বোঝাই করে কমলা এনেছিলেন। সেই থেকে তোমার মার নাম হয় গেল কমলা বৌ।

বাবার গলা কি কিঞ্চিৎ ভারি হয়েছে? খুব সম্ভব না। বাবা ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না।

তোমার মাকে আমি ভালবাসতে শুরু করেছি, তার মৃত্যুর পর। এটা খুব কষ্টের ব্যাপার।

আমি উসখুস করতে লাগলাম। আমার চলে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবার সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যেস আমার নেই। আমাদের কারোরই নেই। আবার উঠে যাবার সাহসও হয় না। বিশ্রী অবস্থা।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয় নতুন করে জীবন শুরু করার একটা সুযোগ থাকা উচিত। এমন একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে সবাই একটা করে সুযোগ পাবে।

তাহলেও দেখবেন সবাই আবার ভুল করবে।

আমি করব না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ হয়তো আসছে, এত রাতে ছাদে আসবে কে? শাহানা নাকি? শাহানা মাঝে-মাঝে অসময়ে ছাদে এসে তার ফুলগাছের সঙ্গে কথা বলে। এই মেয়েটির মনে ভয়টয় কিছু নেই।

শাহানা এসে ঢুকল চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

মামা, আপনার জন্যে একটু কফি এনেছি।

বুঝলি কী করে, আমি এখানে!

খুঁজে-খুঁজে এসেছি।

বাবা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে কফি নিলেন। এই বাড়ির একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে বাবার সহজ সম্পর্ক আছে।

একমাত্র শাহানার সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার মুখের কঠিন দাগগুলি কোমল হয়ে আসে। শাহানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নিচে আস টগর, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

মামা, আপনার চিনি লাগবে না তো?

নাহ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শাহানা বলল, খুব একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে।

কী?

নীলুদের বাসায় আজ রান্না হয় নি।

রান্না হয় নি মানে?

হয় নি মানে, হয় নি। রান্না করার মতো কিছু ছিল না। ঘরে টাকা পয়সাও ছিল না।

বল কি!

নীলুর বাবার আজ মাসখানেক ধরে চাকরি নেই।

শুনলে কার কাছ থেকে?

নীলুর কাছ থেকেই শুনলাম। নীলু খুব কানাকাটি করছে।

সিঁড়ির উপর আমরা বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা মৃদু স্বরে বলল, পৃথিবীতে অনেক রকম কষ্টের ব্যাপার হয়। আমার নিজেরো অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে, কিন্তু...।

সারা দিন কিছু খায় নি।

তা জানি না, তবে তাত সম্ভবত খায় নি।

সারা দিন ভাত খায় নি, এরকম লোকের সংখ্যা এদেশে অনেক। কিন্তু পরিচিত কেউ না–খেয়ে আছে, এটা গ্রহণ করা যায় না। প্রচণ্ড রাগ লাগে। বিকালবেলায় দেখছি বাচ্চাগুলি বাগানে ছোটাছুটি করছে। সবচেয়ে ছোটটি আমাকে দেখে ডাকল, এ্যাই এ্যাই। আমি ফিরে তাকাতেই কদমগাছের আড়ালে গিয়ে লুকাল। এটি তার মজার খেলা। আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, ধরে ফেলব। বাচ্চা দুটি দৌড়ে পালাতে গিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখি এক জনের হাঁটুর কাছটায় ছিলে গেছে। কিন্তু কাঁদল না, আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে উৎসাহী গলায় বলল, বাঘ-বাঘ-খেলবে? আর এই বাচ্চারা ভাত খায় নি? আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ শাহানার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা বলল, আমার যা খারাপ লাগছে। আজ নিশ্চয় প্রথম নয়, আগেও হয়তো হয়েছে।

আমি বললাম, রমিজ সাহেব লোকটির প্রকাশ্যে শাস্তি হওয়া দরকার।

রামিজ সাহেব কি করল?

আমি তার জবাব দিলাম না। শাহানা মৃদু স্বরে বলল, তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই।

বল।

নীলুর বিয়ের কথা হচ্ছে। তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নীলুকে রাজি করাও। ওর জন্যে ভালোই হবে। ছেলে খারাপ না।

আমি রাজি কারাবার কে?

তুমি ভালো করেই জান তুমি কে?

শাহানা গা-জ্বালা ধরান শীতল হাসি হাসল। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি বলব। নীলু কোথায়?

এখনই বলতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।

ঝামেলা চুকিয়ে ফেলি।

আর যদি সাহস থাকে তাহলে.....

তাহলে কি?

ওকে ডেকে এমন একটা কথা বল, যা শোনার জন্যে মেয়েদের মন ভূষিত থাকে।

তৃষিত হয়ে থাকে?

হুঁ, বাংলাটা অবশ্যি একটু কঠিন বলে ফেললাম।

শাহানা হাসল। আমি নিচে এলাম। বাবু ভাই সিঁড়ির কাছে উগ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেট হাতে সে কখনো প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে না।

ব্যাপার কি বাবুভাই?

কিছু না।

ছোটফুফা কোথায়?

জানি না।

তার সঙ্গে সিরিয়াস একটা ফাইট দিলে মনে হয়।

বাবুভাই জবাব দিল না। আমি বললাম, চল, দাদার অবস্থাটা দেখে আসি।

দেখার কী আছে?

দেখার কিছু নেই?

বাবুভাই উত্তর না দিয়ে হনহন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। সে মনে হচ্ছে অত্যন্ত বিরক্ত। তার বিরক্তির আসল কারণ ষ্ট্রের পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পর, যখন দেখলাম বড়োচাচাকে। বড়োচাচার চেহারা ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো। দিশাহারা চাউনি। ঠিক মতো কথাও বলতে পারছেন না, জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আমার হাত ধরে একটা অন্ধকার কোণার দিকে নিয়ে গেলেন। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, টগর, বাবু নাকি উপরে বসে মদ খাচ্ছে?

বলেছে কে আপনাকে?

তোর ছোটফুফা বললেন। মদ খেয়ে নাকি মাতলামি করছে?

বড়োচাচা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। আমি নিজেকে সামলে সহজভাবে বললাম, ছোটফুফা কি সবাইকে এই সব বলে বেড়াচ্ছে?

তুই আগে বল, এটা সত্যি কি না।

সত্যি না, চাচা।

তুই আমার গা ছুঁয়ে বল।

গা ছুঁয়ে বলার কী আছে, যত সব মেয়েলী ব্যাপার!

হোক মেয়েলী ব্যাপার, তুই আমার হাত ধরে বল।

আমি বড়োচাচার হাত ধরে শান্ত স্বরে বললাম, বিশ্বাস করুন চাচা, কথাটা ঠিক না। মিথ্যা বলব কেন?

বড়োচাচা চোখ লাল করে বললেন, তুই নিজে মিথ্যা বলছিস।

কি যে বলেন। মিথ্যা বলব কেন?

বড়োচাচা গম্ভীর স্বরে বললেন, বাবা ওকে যতটা ভালবাসেন, কাউকে তার সিকি ভাগও বাসেন না। সে কিনা এ-রকম একটা সময়ে মদ খাচ্ছে? হারামজাদা কোথাকার!

কথাটা সত্যি না।

টগর, তুই বাবুকে গিয়ে বল, সে যেন এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

কি যে আপনি বলেন চাচা।

যা তুই, এক্ষুণি গিয়ে বল।

এক্ষুণি বলতে হবে কেন? ঝামেলার মধ্যে নতুন ঝামেলা।

সে যদি বাড়ি ছেড়ে না যায়, আমি যাব।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বলছি।

বলবি, সে যেন এককাপড়ে বাড়ি ছেড়ে যায়।

ঠিক আছে।

এবং কোনোদিন যেন এ বাড়িতে তার ছায়া না-দেখি।

মদ খাওয়ার ব্যাপারটা

মদ খাওয়ার ব্যাপারটা দেখলাম বেশ একটা আলোড়ন তৈরি করেছে। মোটামুটি সবাই জানে। চাচা বিদেয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়োফুফুর সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর ভারি শরীর নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, বাবু নাকি মাতলামি করছে?

মাতলামি করবে কেন?

বেহেড মদ খেয়েছে, তাই মাতলামি করছে।

বলেছে কে আপনাকে?

তুই এত জেরা করার বদভ্যাস কোত্থেকে পেলি?

আমি চুপ করে গেলাম। বড়োফুফু, আত্মকে ওঠার ভান করে বললেন, বংশের সম্মানটার কথা কেউ ভাবল না, আশ্চর্য! এত বড়ো পীরবংশ। এত নাম-ডাক। দারুণ একটা মিথ্য কথা এটা। ইদানীং লক্ষ করছি বড়োফুফু বংশ-মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টায় নেমেছেন। অপরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেছেন।–পীরবংশ। খুব খানদানি ফ্যামিলি।

আমাদের গোষ্ঠীতে পীর-ফকির কেউ নেই। দাদার বাবা ছিলেন চাষা। জমিজমা তেমন ছিল না। কাজেই শেষের দিকে পানের ব্যবসা শুরু করেন। সেতাবগঞ্জ থেকে পানের বাকা

মাথায় করে এনে নীলগঞ্জ বাজারে বিক্রি করতেন। এতে তেমন কিছু ভালোমন্দ না হওয়ায় ডিমের কারবার করতে চেষ্টা করেন। চাষা সমাজ থেকে নির্বাসিত হন ডিম বেচার কারণে। তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ে আটকে যায়। ডিম বেচা ব্যাপারীর সঙ্গে সম্বন্ধ করা যায় না। খুবই দুদিন গেছে বেচারার।

এই সব তথ্য দাদার কাছ থেকে পাওয়া। হতদরিদ্র মানুষ যখন দারুণ বড়লোক হয়ে যায়, তখন তার অভাবের গল্প করতে ভালোবাসে। দাদা যখন সুস্থ থাকেন এবং কথা বলার মতো কাউকে পান, তখন শুরু করেন। পুরনো দিনের গল্প। কবে পরপর দু দিন পেয়ারা খেয়ে ছিলেন। কবে বেতন না-দেওয়ার জন্যে স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তাঁর বাবা গিয়ে হেডমাস্টার সাহেবের পা ধরে বসেছিলেন একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। হেডমাস্টার সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, ম্যাটিক পাশ করে হবেটা কি? ছেলেকে কাজে লাগান, সংসারে সাহায্য হোক। দাদার ম্যাট্রিক পাশ করা হল না। তিনিও ডিমের ব্যবসা শুরু করলেন। তুতার চল্লিশ বছর পর নীলগঞ্জে একটি হাইস্কুল এবং একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ দিলেন। দুটিই অবৈতনিক। স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। এখনো করেন।

অভাব এবং অহংকারের গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে না। শুধু আমার একার নয়, কারোই ভালো লাগে না। কাজেই বেশির ভাগ গল্প শুনতে হয় শাহানাকে। এবং সে মেয়েলি ভঙ্গিতে আহা-উঁহু করে, বলেন কি নানাভাই, এ রকম অবস্থা ছিল? কী সর্বনাশ! থাক থাক আর বলবেন না, কষ্ট লাগে। দাদা তাতে উৎসাহ পেয়ে আরো সব ভয়াবহ কষ্টের বর্ণনা শুরু করেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

পৃথিবীতে বৃদ্ধদের মতো বিরক্তির আর কিছুই নেই। বৃদ্ধরা অসুন্দর বুদ্ধিহীন নারীদের চেয়েও বিরক্তিকর। বাবুভাইয়ের মতে পঞ্চাশের পর এদের সবাইকে কোনো একটি দ্বীপে চালান করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করা উচিত। যেখানে সব বুড়ো-বুড়ি মিলে এক সঙ্গে বকবক করবে। ছ মাসে এক বার জাহাজ গিয়ে তাদের খাবার দাবার দিয়ে আসবে।

আমাদের বংশ দীর্ঘজীবী বংশ। দাদার ডিমা-বেচা বাবা মারা গিয়েছিলেন প্রায় এক শ বছর বয়সে। শেষ সময়ে চোখে দেখতেন না, কানে শুনতেন না, চলচ্ছক্তি ছিল না। দিনরাত নিজের মলমূত্রের মধ্যে বসে থেকে পশুর মতো গো-গোঁ করতেন। সবই শোনা কথা। মায়ের কাছ থেকে শুনেছি। দাদার এই অতিবৃদ্ধ বাবাকে দেখবার কেউ ছিল না। তিনি গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকতেন। সেখানে তখনো সেই প্রকাণ্ড দালান (যা পরে নীলমহল নামে খ্যাত হয়) তৈরী হয় নি। দাদা সবে টাকা পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছেন। বন্যার মতো সম্পদ আসা শুরু হয় নি।

মানুষের মল এবং মূত্রের মধ্যে জীবনদায়িনী কিছু হয়তো আছে। দাদার বাবা মলমূত্র মেখে প্রায়-অমর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু বার্ধক্যজনিত কারণে হয় নি। হয়েছিল। ইদুরের কামড়ে। শোনা যায় ইঁদুর কামড়ে তাঁর নাভির কাছ থেকে মাংস তুলে নিয়েছিল। সেই কামড় বিষিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলের সীমাহীন ক্ষমতার কিছুই তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

তাঁর মৃত্যুর দু বছরের মধ্যেই নীলমহল তৈরির কাজ শুরু হয়। সে নাকি এক রাজকীয় ব্যাপার! গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল, ডিমা-বেচা খবির মিয়ার ছেলে সোনার মাইট পেয়েছে। রাজা-বাদশাদের সঞ্চিত গোপন স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ সাতটা ঘড়া। সবাই বলত–এই সব পাপের

অর্থ কি আর ভোগে লাগবে? লাগবে না। তাদের কথা আংশিক ফলে গেল। দাদা বা তাঁর বংশধররা কেউ সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকল না। দাদার দশা হল বাবুই পাখির মতো। বাবুই পাখি বহু কষ্টে বহু মমতায় চমৎকার একটি বাসা বানায়, সে নিজে বাসাটিতে বাস করতে পারে না। রোদ বৃষ্টি বাদলে বসে থাকে বাইরে, বাসায় নয়। তার চোখের সামনে ভালোবাসায় তৈরি বাসাটি হাওয়ায় দোল খায়।

দাদারও তাই হল। নীলমহলে তিনি গিয়ে উঠতে পারলেন না। কারণটি বিচিত্র। রাতদুপুরে সে-বাড়ির ছাদে অশরীরী শব্দটব্দ হতে লাগল। কোথায়ও হাওয়া নেই, নীলমহলের জানালা আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে। রাতের বেলা খড়ম পায়ে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কে যেন হাঁটে। নীলমহলের ছাদে নাকি আগুনের কুণ্ড হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে ওঠে। আজগুবি সব ব্যাপার। নিশ্চয়ই এ সবের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, কিংবা সবটাই মনগড়া। কিন্তু মানুষমাত্রই কিছু-না–কিছুতে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। দাদা নীলমহল ছেড়ে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে এলেন বাস করতে।

সেই চমৎকার বাড়িটির জন্যে তাঁর কি মন কদে? তাঁর ভালোবাসার নীলমহল। মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত অতীত নাকি ছবির মতো ভেসে ওঠে। নীলমহলের অতীত কি ভাসছে তাঁর সামনে? আজ কি তাঁর মনে হচ্ছে, সমস্তই অর্থহীন? নীলমহল-লালমহল কোনো মহলাই কাজে আসে না। আজ তাঁর যাত্রা অজানা এক মহলের দিকে, যার রঙ তাঁর জানা নেই।

ছোটফুফা কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন। দাদার কিছু একটা হয়ে গেলে গণ্যমান্য যাদেরকে খবর দেওয়া হবে তাদের নাম-ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা হচ্ছে। দেখতে-দেখতে তিনি ফুলস্কেপ কাগজ তিন-চারটা ভরিয়ে ফেললেন। বাবুভাইকে বললেন, দেখ তো, কেউ বাকি আছে কিনা?

বাবুভাই না তাকিয়েই বললেন, না, সবাই আছে।

না দেখেই কী করে বললি?

দেখতে হবে না। যা লিখেছেন ঠিকই লিখেছেন। সবাই আছে।

কেউ বাদ গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

কেলেঙ্কারি হবে কেন?

ফুফা বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। বরফশীতল স্বরে বললেন, সামাজিকতার একটা ব্যাপার আছে।

মানুষ মারা যাচ্ছে, এর মধ্যে আবার সামাজিকতা কী?

মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সামাজিকতা নেই?

না। এটার মধ্যে এসব কিছু নেই।

বাবু ভাই হাই তুললেন। তিনি ফুফাকে রাগাতে চাইছেন। ফুফা গম্ভীর স্বরে বললেন, এটা একটা খান্দনী ফ্যামিলি। জলে-ভাসা ফ্যামিলি না। খান্দানী ফ্যামিলিতে অনেক রকম সামাজিকতা আছে।

খান্দানী! আমরা খান্দানী হলাম কবে? আমি যতদূর জানি, আমাদের পূর্বপুরুষ চাষা ছিলেন। কেউ কেউ হাটে গিয়ে ডিম বেচতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এক জন সিঁধেল চোর ছিল। কানুচোরা নাম।

এ রকম কোনো কিছু তো জানি না।

আমি জানি।

ছোটফুফা মুখ অন্ধকার করে ফেললেন। বাবুভাই বললেন, একটা লোক মারা যাচ্ছে, তাকে মরতে দিন।

কিসের সঙ্গে কী বলছ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

মাথা ঠিকই আছে। ঠিক আছে বলেই বলছি, আমরা খান্দানীফান্দানী না।

ছোটফুফা গম্ভীর হয়ে বললেন, তর্ক করা তোমার একটা বদ অভ্যাস। এটা ছাড়া উচিত।

বাবুভাই ঘাড় মোটা করে বললেন, আমাদের খান্দানী কি জন্যে বলছেন সেটা আগে বলুন।

তোমরা খান্দানী না?

না।

বেশ তো ভালো কথা। তোমার ইচ্ছাটা কি? কাউকে কোনো খবর দেওয়া হবে না?

খবর দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

তুমি ঠিক সোবার অবস্থায় নেই! তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই না!

কথা বলতে না-চাইলে বলবেন না।

ছোটফুফা মুখ কালো করে উঠে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম। মাথা ব্যথা করছে। আমার টেবিলের ড্রয়ারে এনসিন আছে। কিন্তু বাবুভাই ঘর বন্ধ করে বসে আছেন। দরজায় ধাক্কা। তেই তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, কে?

আমি।

যা এখন।
ঘুমোচ্ছ নাকি?
না, ঘুমাচ্ছি-টুমাচ্ছি না। তুই যা, বিরক্ত করিস না।

দরজাটা একটু খোল।

বাবুভাই জবাব দিলেন না।

কী সুন্দর লাগছে নীলুকে

রান্নাঘরে আকবরের মাকে দেখা গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে গ্যাসের চুলায় একটা মাঝারি আকারের ডেকচিতে পানি ফুটছে। নির্ঘাত আকবরের মার কাণ্ড। পানি ফোটাতে দিয়ে ঘুমুতে শুরু করেছে। কাউকে ঘুমুতে দেখলেই ঘুম পায়। আমি হাই তুললাম। তারপর এক সময় আবার নেমে এলাম নিচে। নিচের বারান্দা জনশূন্য। মৌলানা সাহেব পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে বসার ঘরে তাঁর ঘুমাবার ব্যবস্থা হয়েছে। মৃত্যুর অপেক্ষা করতে গিয়ে সখাই বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দাদার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি–সিরিয়াস ব্যাপার। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে হ্যাঁঙ্গার জাতীয় জিনিসে। মোটামুটি একটা হাসপাতাল। হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। রুগীর মনে হয় অক্সিজেন দেওয়ায় কিছুটা আরাম হয়েছে। ছটফটানি নেই। নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন। এদিকে বড়োচাচীর ঘুম ভেঙেছে। তিনি একটি মোটামতো নার্সের সঙ্গে আলাপ করছেন। বড়োচাচীর মুখ গভীর। নার্সটির মুখ হাসি-হাসি। নার্স কখন এসেছে কে জানে। ছোটফুফুর কাণ্ড নিশ্চয়ই।

এক বার দাদার শরীর খারাপ হল। ব্লাড প্রেশার বা এই জাতীয় কিছু-মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। খবর পাওয়ামাত্র ছোটফুফা এক জন নার্স নিয়ে উপস্থিত। দিনরাত এখানে থাকবে। নার্সটির নাম ছিল–সুশী। খ্রিশ্চিয়ান। বয়স কম। খুব মিষ্টি চেহারা নাসটির। এমন সব সুন্দরী নার্স থাকে, আমার জন্য ছিল না। সুশী সেই জাতীয় নার্স, যাদের সঙ্গে হাসপাতালের ইন্টানী ডাক্তারদের প্রেম হয়। রুগীরা যাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল থাকে।

সুশী অল্প সময়ের মধ্যে দাদাকে সারিয়ে তুলল। দু দিনের মধ্যে দেখা গেল দাদা বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন! সুশী তার পাশে অন্য একটি চেয়ারে বসে গম্ভীর মুখে ফুশফুশ করে সিগারেট টানছে। মাঝে মাঝে দাদা কীসব বলছেন, সুশী সে-সব শুনে খুব হাসছে। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দাদা কি ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন? সেবার সুশীকে উপহার হিসেবে একটি রাজশাহী সিলের শাড়ি এবং কাশ্মীরী শাল দিলেন। উপহার পেয়ে তার কোনো ভাবান্তর হল না। যেন এ রকম উপহার সে সব সময়ই পেয়ে আসছে। রেগে গেলেন বড়োফুফু। খুব হৈ-চৈ করতে লাগলেন। একটা নার্সকে দু হাজার টাকার শাল? বাবার না হয় মাথা খারাপ, তাই বলে কি অন্য সবারও মাথা খারাপ, কেউ একটা কথা বলবে না? আমি ফুফুকে বললাম, আপনি যখন এসেছেন, আপনিই বলুন।

বলবই তো, এক শ বার বলব। একটা রাস্তার মেয়েকে দু হাজার টাকার শাল দেবে কেন?

রাস্তার মেয়ে হবে কেন? নার্স এক জন। ভালো নাস। দাদাকে সারিয়ে তুলেছে।

বাজে বকবক করিস না তো। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি বাবার কাছে।

ফুফু ফুটে গেলেন দাদার ঘরে, ফিরে এলেন মুখ অন্ধকার করে। কী কথাবার্তা হল জানা গেল না।

অবশ্যি আজকের এই নার্সটির চেহারা বাজে। মুখে বসন্তের দাগ। বিরাট স্বাস্থ্য। মাংসের চাপে চোখ ছোট হয়ে গেছে। আমাকে উঁকি দিতে দেখেই নার্সটি চট করে। রুগীর কাছে গেল। অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে স্যালাইনের বোতলটি নেড়েচেড়ে দিল। এ সুশীর মতো নয়। সুশী।

এখানে থাকলে দাদার শরীর হয়তো অনেকখানি সেরে যেত! আমার ধারণা চোখ মেলে এই নার্সটিকে দেখামাত্র আবার দাদার হাঁপানির টান উঠবে।

বড়োচাচী চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন আমার কাছে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, নার্সকে আনাল কে?

জানি না।

বড়োচাচী আমার সঙ্গে বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গভীর। আমি বললাম, শুধু আপনারা দু জন? আর মানুষজন কোথায়?

জানি না কোথায়।

আমি লক্ষ করলাম বড়োচাচী কথা বলছেন খুব নিচু গলায়। কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকলে তাঁর এ-রকম হয়। কথাই শুনতে পাওয়া যায় না।

শুনেছিস নাকি, তোর বড়োচাচা বাবুকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে?

কি যে বলেন!

হ্যাঁ করেছে। আমাকে বলল।

এই সব কিছু না চাচী। মুসলিম আইনে ত্যাজ্যপুত্র হয় না।

তোকে কে বলল?

আমি জানি। হিন্দু আইনে হয়, মুসলিম আইনে হয় না। আর খামাকা ত্যাজ্যপুত্র করবে। কেন?

মদ খেয়ে মাতলামি করছিল, এই জন্যে করেছে।

না চাচী, এই সব কিছু না।

বড়োচাচীর মুখ সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে উঠল। ইনি যে-কোনো কথা বিশ্বাস করেন। তাঁকে কেউ যদি এসে বলে–দেখে এলাম বুড়িগঙ্গায় একটা মৎস কন্যা ধরা পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, সত্যি? কথা বলতে পারে? চুল কত বড়ো? মানুষের বুদ্ধি যে ঠিক কতটা কম হতে পারে তা চাচীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

বুঝলি টগর, আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোকের ছেলে, মদ খাবে কি?

আমি বললাম, কেউ যদি খায়ও সেটা কোনো সিরিয়াস ব্যাপার না। ওষুধের সঙ্গে তো সবাই খাচ্ছে।

তাই নাকি?

হুঁ। হোমিওপ্যাথি অযুদ্ধর সবটাই তো মদ।

তুই জানালি কোথেকে?

এটা নতুন কথা নাকি? সবাই জানে।

আগে আমাকে বলিস নি কেন?

আগে বললে আপনি কি করতেন?

তাও ঠিক, কি করতাম।

বড়োচাচী নিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসলেন–তাঁর বুক থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেছে। আমাকে বললেন, তোর চাচা এমনভাবে বলল কথাটা যে আমি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম।

সব কথা এরকম চট করে বিশ্বাস করবেন না চাচী।

না, এখন থেকে আর করব না।

এই সময় বড়োফুফুকে উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিচে নামতে দেখা গেল। আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। যেন আমাদেরকেই খুঁজছিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, নীলু নামের ঐ মেয়েটির ঘরে নাকি আজ রান্না হয় নি?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এরকম চোঁচোনর কি মানে? বড়োচাচী কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন।

কার ঘরে রান্না হয় নি?

ঐ যে তোমাদের ভাড়াটে। নীলু নাম যে মেয়েটির।

আমি বললাম, যা বলার আস্তে বলুন ফুফু।

আস্তে বলব কেন?

ওরা শুনবে!

শুনলে শুনবে। তোর আঙ্কেল দেখে আমি অবাক হয়েছি। এই রকম একটা ভিখিরি শ্রেণীর মেয়ে, আর তুই ওর সঙ্গে দিব্যি বিয়ের কথাবার্তা চালালি?

বড়োচাচী স্তম্ভিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে? কই, আমি তো কিছু জানি না।

তুমি চুপ কর ভাবী। তোমার কিছু জানতে হবে না। টগর, তোদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোদের উপর নির্ভর করে আমি অনেক বার বেইজিত হয়েছি। মেয়েটাকে আমি বাসায় পর্যন্ত যেতে বলেছি।

বলে দিলেই হয়, যেন না যায়।

হ্যাঁ বলব। একদম রাস্তার ভিখিরি, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।

আস্তে বলুন ফুফু। চিৎকার করছেন কেন?

চিৎকার করব না? তোদের কোনো মান-অপমান নেই বলে কি আমারো নেই? যত ছোটলোকের আড্ডা হয়েছে! সমস্ত ছোটলোকদের কোটিয়ে আমি বিদায় করব। পেয়েছে কি?

দারুণ একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। বড়োচাচা এলেন। বাবা নেমে এলেন তিনতলা থেকে। নীলু। এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। রামিজ সাহেব এলেন আমাদের বসার ঘর থেকে। সন্ধুচিত ভঙ্গিতে বললেন, কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

নীলু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, উনি এসব কথা বলছেন কেন?

আমি বললাম, তুমি দাদার ঘরের দিকে একটু যাও তো নীলু। দেখে এস কিছু লাগবে কিনা। নীলু নড়ল না। আমি লক্ষ করলাম সে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ রক্তশূন্য। বড়োফুফু। সমানে চেঁচাচ্ছেন, যত রাস্তার ছোটলোক দিয়ে বাড়ি ভর্তি করা হচ্ছে। এদের ঘাড় ধরে ধরে আমি বিদেয় করব। আমার ছেলের সঙ্গে একটা ভিখিরির মেয়ের বিয়ের কথা বলছে। এত বড়ো সাহস!

নীলু বলল, আপনি চুপ করুন।

বড়োফুফু চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মাথা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নীলু বলল, বাবা তুমি যাও এখান থেকে। রমিজ সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে

লাগলেন। এই অবস্থা স্থায়ী হল না। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, কিসের জটলা হচ্ছে? এতেই ভিড় পাতলা হল। বড়োফুফু এবং চাচী, দাদার ঘরের দিকে এগোলেন, আমি উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। নীলুর দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করলাম। নীলুকে তা স্পর্শ করল না। হালকা স্বরে বললাম, শাহানা কোথায়, নীলু? নীলু। তার জবাব না দিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেল।

শাহানাকে পাওয়া গেল। তেতলার বারান্দায়। সেখানে একটা ইজিচেয়ারে সে আধশোওয়া হয়ে বসেছিল। আমাকে দেখেই সোজা হয়ে বসল। তার বসার ভঙ্গিটা ছিল অদ্ভুত একটা ক্লান্তির ভঙ্গি। বাবুভাই কি তাকে কিছু বলেছে? বিশেষ কোনো কথা–যার জন্যে একটি মেয়ের হৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে?

আমি খুব নরম স্বরে বললাম, বাবুভাই কি তোমাকে কিছু বলেছে?

শাহানা জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। বারান্দার আলো কম বলেই এতক্ষণ চোখে পড়ে নি, এখন দেখলাম শাহানার গাল ভেজা। সে তার ভেজা গাল গোপন করার জন্যেই অন্য দিকে তাকিয়ে আছে? কারো গোপন কষ্টে উপস্থিত থাকতে নেই। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। শাহানা বলল, নিচে হৈ-চৈ হচ্ছিল কিসের? বড়োফুফু একটা ঝামেলা বাধিয়েছেন। নীলুকে আজেবাজে সব কথা বললেন।

শাহানা কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। আমি বললাম, তুমি একটু নীলুকে খুঁজে বের করবে? কথা বলবে ওর সঙ্গে?

শাহানা উত্তর দিল না।

এই সময় নিচ থেকে সাড়াশব্দ হতে লাগল। দাদা কি মারা গিয়েছেন? আমরা ছুটে নিচে এলাম। দাদার কিছু হয় নি। তিনি তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। হৈ-চৈ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচিত্র কারণে। রামিজ সাহেব অন্ধকার বাগানে একা একা ছোটাছুটি করছেন যেন অদৃশ্য কিছু তাঁকে তাড়া করছে। সবাই এসে ভিড় করেছে বারান্দায়। আমাদের ড্রাইভার টর্চলাইটের আলো তাঁর গায়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। বড়োফুফু চাপা স্বরে বললেন, পাগল-ছাগল আর কি! দিব্যি ভালোমানুষের মতো বসেছিল। হঠাৎ ছুটে চলে গেল।

কদমগাছের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ ভেসে এল। এ হাসি পৃথিবীর হাসি নয়। এ হাসি অচেনা কোনো ভুবনের। যারা বারান্দায় জটিল। পাকাচ্ছিল, সবাই একসঙ্গে চুপ করে গেল। বাবুভাই বাগানে নেমে গেল। এগিয়ে গেল। কদমগাছের দিকে। নীলুকে দেখা গেল না। শুধু দেখলাম বিলু তাদের দরজার পাশে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একসময় ছোট মেয়েটি বাগানে নেমে গেল। চারিদিক চুপচাপ, শুধু বাগানের শুকনো পাতায় তার হেটে যাবার মচমচ শব্দ হতে লাগল।

বাবুভাই রমিজ সাহেবের হাত ধরে তাঁকে এনে বারান্দায় বসাল। রামিজ সাহেবের চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। সমস্ত মুখমণ্ডল ঘামে ভেজা। বাবুভাই বলল, রমিজ সাহেব, এখন কেমন লাগছে?

ভালো।

আমাকে চিনতে পারছেন?

জ্বি।

কী নাম আমার, বলুন দেখি?

রমিজ সাহেব নিঃশব্দে হাসলেন। বিলু। তার বাবার শার্ট শক্ত করে ধরে রেখেছে; ভয়ানক অবাক হয়েছে সে।

বাবার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

এ রকম করছে কেন?

ঠিক হয়ে যাবে। মাথায় পানি ঢাললেই ঠিক হয়ে যাবে!

বাবুভাই রমিজ সহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন কি একটু ভালো লাগছে?

জ্বি হ্যাঁ। লাগছে।

আমি কে বলুন?

রমিজ সাহেব। আবার হাসলেন। নীলু। এগিয়ে আসছে। রমিজ সাহেব তাকালেন নীলুর দিকে। তাঁকে দেখে মনে হল না, তিনি নীলুকে চিনতে পারছেন। নীলু ভয়-পাওয়া গলায় বলল, বাবার কী হয়েছে?

দাদা মারা গেলেন ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে। নব্বুই বৎসর আগে দরিদ্র কৃষক পরিবাবে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নব্বুই বছর তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের অসম্ভব বিত্তশালী করে দিয়ে নিঃশব্দে মারা গেলেন।

সকাল হচ্ছে। পুবের আকাশ অল্প অল্প ফর্সা হতে শুরু করেছে। অনেক দিন সূর্যোদয় দেখা হয় নি। আমি ছাদের আলিশায় হেলান দিয়ে সূর্যের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। শুধু বাবুভাই রমিজ সাহেবের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বসে আছে। আরো অনেক দূরে টিউবওয়েলের পাশে, পাথরের মূর্তির মতো নীলু বসে আছে একা একা। আমার খুব ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলি, নীলু, ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই তো ঠিক হয় না। সকালের পবিত্র আলোয় কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে নেই।

তবু আমাদের সবার মিথ্যা আশ্বাস দিতে ইচ্ছে করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে নীলুরু-পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। ভোরের আলো এসে পড়ছে নীলুর চোখেমুখে। কী সুন্দর লাগছে নীলুকে।